হারামণির অন্বেষণ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত।

Calcutta
S. K. LAHIRI & CO
54, College Street
1908

সূচীপত্র।

হারামণির অন্বেষণ।

উপক্রমণিকা।

প্রাণ চায় তো আর-কিছু না—কেবল সে খাইয়া-পরিয়া কথঞ্চিৎপ্রকারে বর্ত্তিয়া থাকিতে পারিলেই বাঁচে। মনের আকিঞ্চন আর-একটু বেশী—মন চায় আনন্দে বর্ত্তিয়া থাকিতে। জ্ঞান হাত বাড়ায় আরো উচ্চে—জ্ঞান চায় অক্ষয়ধনে ধনী হইয়া নিত্যকাল আনন্দে বর্ত্তিয়া থাকিতে, অর্থাৎ আনন্দে বর্ত্তিয়া থাকা'র ব্যাপারটাকে আপনার কর্ত্তৃত্বের মুঠার মধ্যে আনিতে। জ্ঞান যাহা চায়, তাহা সে পাইবে কেমন করিয়া? জ্ঞান যে আত্মবিস্মৃত। একএকবার বিদ্যুতের ন্যায় যখন তাহার স্মৃতি গা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে, তখন সে মাথা তুলিতেছে—তাহার পরক্ষণেই নতশির! আত্মাকে হারাইয়া জ্ঞান দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছে বড়ই বিষম! মণিহারা ফণীর ন্যায় অধীর হইয়া উঠিতেছে যখন-তখন! হারামণি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে যেখানে-সেখানে! চেষ্টা ছাড়িতেছে না কিছুতেই! একবার'কার রোগী যেমন আরবার-কার রোঝা হয়, জ্ঞান তেম্নি—একবার প্রাণ হইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে, একবার মন হইয়া প্রশ্ন তুলিতেছে, একবার বুদ্ধি হইয়া উত্তর প্রদান করিতেছে। বুদ্ধির কথা—একবার মন বুঝিতছে, প্রাণ বুঝিতেছে না; একবার প্রাণ বুঝিতেছে, মন বুঝিছে না; একএকবার আবার এমনও হইতেছে যে, "বুদ্ধির কথা নিজে বুঝিতেছে কি না, সন্দেহ। নানা শ্রেণীর

নানা কথার ঘ্যান্‌ঘ্যানানিতে তিতিবিরক্ত হইয়া আমি জ্ঞানকে বলিলাম—"তোমার আপনার সঙ্গে আপনার এরূপ বোঝাপড়া চলিতে থাকিবে কতদিন?" ভাবিত অন্তঃকরণে ভ্রূললাট কুঞ্চিত করিয়া জ্ঞান তাহার উত্তর দিলেন এই যে, "হারামণি পাওয়া না যাইবে যতদিন।"

প্রশ্নোত্তর।

মূল জিজ্ঞাস্য দুইটি—(১) কি আছে এবং (২) কি চাই। ইহার সোজা উত্তর এই যে, আছে সত্য,—চাই মঙ্গল।

প্রশ্ন। এ যে একটি কথা তুমি বলিতেছ "আছে সত্য"—তোমার এই গোড়া'র কথাটি'র ভাবার্থ আমি এইরূপ বুঝিতেছি যে যাহা আছে, তাহাই সত্য। তবেই হইতেছে যে, সবই সত্য—সত্য-ছাড়া দ্বিতীয় পদার্থ নাই। কিন্তু মঙ্গল চাহিতে গেলে মঙ্গল বলিয়া একটা পৃথক্ বস্তু থাকা চাই, আর, তা ছাড়া—চাহিবার একজন কর্ত্তা থাকা চাই। সত্য ছাড়া দ্বিতীয় পদার্থ যখন নাই—তখন যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া তদ্ব্যতীত চাহিবার বস্তুই বা পাইতেছ কোথা হইতে—চাহিবার কর্ত্তাই বা পাইতেছ কোথা হইতে?

উত্তর। সত্য আপনিই চাহিবার বস্তু, আপনিই চাহিবার কর্ত্তা। সত্য আপনাকে আপনি চা'ন, আপনাকে আপনি পা'ন, আপনাতে আপনি আনন্দে বিহার করেন;—সত্যই মঙ্গল।

প্রশ্ন। আপনাকে-আপনি-চাওয়াই বা কিরূপ, আপনাকে-আপনি-পাওয়াই বা কিরূপ?

উত্তর। সত্য যদি কস্মিন্‌কালেও কাহারো নিকট প্রকাশিত

না হ'ন; না আপনার নিকটে—না অন্যের নিকটে—কাহারো নিকটে কোনকালে প্রকাশিত না হ'ন, আর, কোনোকালে যে কাহারো নিকটে প্রকাশিত হইবেন—মূলেই যদি তাহার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে "সত্য-আছেন"-কথাটাই মিথ্যা হইয়া যায়। সত্য যদি প্রকাশই না পা'ন, তবে তিনি যে আছেন, তাহা কে বলিল? তাহার প্রমাণ কি? সত্য যদি তোমার নিকটে জন্মেও প্রকাশ না-পাইয়া থাকেন, আর, তবুও যদি তুমি বলো "সত্য আছেন", তবে তোমার সে কথার মূল্য—এক কানাকড়িও নহে। দ্বিপ্রহর রজনীতে তুমি যখন প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলে, তখন তুমি ভাবিতেও পার নাই যে, সত্য বলিয়া এক অদ্বিতীয় ধ্রুবপদার্থ সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে বিদ্যমান। তোমার নিদ্রাভঙ্গে যখন তোমার নবোন্মীলিত চক্ষে চেতনের কপাট এবং দিকৃচক্র-বালে আলোকের কপাট—এক কপাট মর্ত্ত্যলোকে এবং আর-এক কপাট স্বর্গলোকে—দুই লোকে দুই কপাট একই সময়ে উদ্ঘাটিত হইল, আর, সেই শুভযোগে যখন তুমি উপরে-নীচে আশেপাশে এবং চারিদিকে চাহিয়া-দেখিয়া জানিতে পারিলে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কল্যও যাহা ছিল—অদ্যও তাহাই আছে, আর, সেই সঙ্গে যখন দেখিলে যে, বিশ্বজননী প্রকৃতির ক্রোড়ে কল্যও যেমন নিঃশঙ্ক-চিত্তে বসিয়াছিলে, অদ্যও তেমনি নিঃশঙ্কচিত্তে বসিয়া আছ, তখন তোমার মন বলিল যে, সত্য আছেন, আর, তোমার সুবুদ্ধি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সায় দিল। "কে তোমাকে জাগাইয়া তুলিল?" এখন তোমার মুখে কথা ফুটিয়াছে, তাই তুমি বলিতেছ "আমাকে কেহই জাগাইয়া তোলে নাই—আমি আপ্নি জাগিয়া উঠিয়াছি।" এটা তুমি দেখিতেছ না যে, তুমি যাহাকে বলিতেছ "আমি আপ্নি" —তোমার গতরাত্রের প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় সে আপ্নি ছিলই না

মূলে, তাহার পরিবর্ত্তে ছিল কেবল একটা অন্ধ, পঙ্গু এবং অকর্ম্মণ্যের একশেষ তোমার বিছানায় পড়িয়া। সেই অসাড় অপদার্থটার কর্ম্ম কি আপনার বলে অজ্ঞান-অন্ধকার ঠেলিয়া-ফেলিয়া জ্ঞানে ভর দিয়া দাঁড়ানো? যাহার হাত-পা অসাড়, চক্ষু অন্ধ, তাহার কি কর্ম্ম সাঁতার দিয়া পদ্মা পার হইয়া উচ্চডাঙায় উঠিয়া দাঁড়ানো? সে তো তখন অকর্ত্তা। অকর্ত্তা'র আবার কর্ম্ম কিরূপ? অকর্ত্তার কর্ম্মও যেমন, আর, বন্ধ্যার পুত্রও তেম্নি দুইই সমান। ফল কথা এই যে, তোমার প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় একে তো জাগিয়া উঠিতে পারিবার মতো শক্তি ছিল না তোমার হাড়ে একবিন্দুও; তাহাতে আবার, জাগিয়া উঠিবার ইচ্ছা যে, কোনো দিক্ দিয়া তোমার মনের ত্রিসীমার মধ্যেও প্রবেশ করিবে, তাহার পথ ছিল না মূলেই। অতএব এটা স্থির যে, তুমি আপন ইচ্ছায় জাগিয়া ওঠো নাই। কাহার ইচ্ছায় তবে তোমার মনের অজ্ঞান অন্ধকার ঠেলিয়া-ফেলিয়া প্রাণের ভিতর হইতে জ্ঞানের আলোক অল্পে-অল্পে ফুটিয়া বাহির হইল? সত্য ভিন্ন যখন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, তখন কাজেই বলিতে হইতেছে যে জাগ্রৎজগতেই হো'ক্ আর নিদ্রিত জগতেই হো'ক্, পর্ব্বতশিখরেই হো'ক্ আর সমুদ্র-গর্ভেই হো'ক্, পর্ণকুটীরেই হো'ক্ আর স্বর্ণপ্রাসাদেই হো'ক্— যেখানে যে-কোনো কার্য্য হইতেছে, হইতেছে তাহা সত্যেরই ইচ্ছায়—তোমার ইচ্ছায়'ও নহে, আমার ইচ্ছায়'ও নহে। সত্যই আপন ইচ্ছায় তোমাকে জাগাইয়া-তুলিয়া তোমার নিকটে প্রকাশিত হইলেন; তা' শুধু না—তিনিই আপন ইচ্ছায় তোমাকে জাগাইয়া-রাখিয়া তোমার নিকটে প্রকাশ পাইতেছেন, আর, প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়াই, তুমি অকুতোভয়ে বলিতে পারিতেছ যে, সত্য আছেন। সত্য এই যে তোমার নিকটে প্রকাশিত হইতেছেন,

আর, তুমি যে সত্যের প্রকাশ নয়ন ভরিয়া পান করিয়া প্রত্যহ পুনর্জন্ম লাভ করিতেছ, ইহার অবশ্যই কোনো-না-কোনো নিগূঢ় কারণ আছে—নহিলে সত্যই বা তোমার কে, আর, তুমিই বা সত্যের কে যে, তুমি সত্যের দেখা না পাইলে তোমার মঙ্গল নাই, আর, সত্য তোমাকে দেখা না দিলে তাঁহার নিস্তার নাই! কেমন করিয়া বলিব যে, তুমি সত্যের কেহই না বা সত্য তোমার কেহই না। তুমি তো আর অসত্য নহ। তুমি যে আমার চক্ষের সম্মুখে সত্য দেদীপ্যমান! তুমি যদি অসত্য হইতে, তবে তোমাকে কে বা পুছিত? তুমি সত্য বলিয়াই সত্য তোমার নিকটে প্রকাশিত হইতেছেন; সত্য সত্যেরই নিকটে প্রকাশিত হইতে-ছেন—পরের নিকটে না। অতএব এটা স্থির যে তোমার নিকটেই হো'ক্, আমার নিকটেই হো'ক্, আর তৃতীয় যে-কোনো ব্যক্তির নিকটেই হো'ক্ যাহারই নিকটে সত্য প্রকাশ পা'ন—প্রকাশ পা'ন তিনি সত্যেরই নিকটে—আপনারই নিকটে। সত্যের এই যে আপনার নিকটে আপনার প্রকাশ, ইহারই নাম আপনাকে আপনি পাওয়া। কেন না, সত্যের প্রকাশেরই নাম সত্যের উপলব্ধি, আর, তাহারই নাম সত্যকে পাওয়া। আপনাকে-আপনি-পাওয়া কিরূপ, তাহা দেখিলাম, এখন আপনাকে-আপনি-চাওয়া কিরূপ, তাহা দেখা যা'ক্।

আপনার প্রকাশে যখন আপনার প্রতি আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, তখন আপনার প্রতি আপনার দৃষ্টির সেই যে প্রসক্তি, তাহা শুধুই কি কেবল চক্ষের চাওয়া? উদাসীন পরিব্রাজক পার্শ্বস্থ পুরস্বামীর প্রতি যে-ভাবে মুহূর্ত্তেক চাহিয়া আপনার গন্তব্যপথ অনুসরণ করেন, উহা কি সেইভাবের চাওয়া? সত্য কি আপনার নিকটে আপনি কোথাকার কোন্-

একজন বেয়ানা পথিক? তাহা হইতেই পারে না। ঠিক্ তাহার বিপরীত। পরস্পরের পছন্দসই সুবিবাহিত বরকন্যার শুভদৃষ্টির বিনিময়কালে উভয়ের চক্ষের চাওয়া'র মধ্য দিয়া কেমন্ অকৃত্রিম প্রাণের চাওয়া বাহির হইয়া পড়িতে থাকে—তাহা তো তোমার দেখিতে বাকি নাই! সেইভাবের প্রাণের চাওয়ার সঙ্গে আপনাকে-আপনি-চাওয়া'র সৌসাদৃশ্য থাকিবারই কথা, কেন না, সুবিবাহিত বরকন্যা দোঁহে দোঁহার দ্বিতীয় আপ্নি। এটাও কিন্তু দেখা উচিত যে, দুয়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্য যতই থাকুক্ না কেন, তাহা সৌসাদৃশ্য বই আর কিছুই নহে; সে সৌসাদৃশ্য একপ্রকার অপ্রতিমের প্রতিমা বা জ্যোতির্মণ্ডলের গাত্রচ্ছায়া। প্রকৃত কথা এই যে, সত্য যে কিরূপ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-পবিত্র-মধুময়-ভাবে আপনার প্রতি আপনি চা'ন আর, সেই অনিরুদ্ধ জ্ঞানের চাওয়ার মধ্য দিয়া অতলস্পর্শ গভীর প্রাণের চাওয়া যে কিরূপ অপরিসীম ধীর-গম্ভীর এবং অটল শক্তিপ্রভাবে—মহাসংযম এবং মহা-উদ্যম দুয়ের অনির্ব্বচনীয় যোগপ্রভাবে উদ্বেল হইয়া, জ্যোতির্ম্ময় আশীর্ব্বাদে নিখিল ব্যোম উদ্দীপিত করিয়া, ভূর্ভুবস্বঃ হইয়া, দশদিকে ফাটিয়া পড়িতেছে, তাহা (আমরা তো কীটাণুকীট) মহোচ্চ দিব্যধামবাসী মুনিঋষি এবং দেবতাদিগেরও ধ্যানের অতীত।

প্রশ্ন। তা তো বুঝিলাম। কিন্তু তাহাতে আমার জিজ্ঞাসা থামিতেছে কই?—বরং বৃদ্ধিই পাইতেছে। আমি চাই জানিতে চাওয়া এবং পাওয়া একত্র বাস করিবে কেমন করিয়া? বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল পি'বে কেমন করিয়া? আমি তো এই-রূপ বুঝি যে, যতক্ষণ পাওয়া না হয়, ততক্ষণই প্রাণের ভিতর হইতে চাওয়া বাহির হইতে থাকে; পাওয়া হইলেই চাওয়া ঘুচিয়া যায়। তবে যদি বলো যে, সত্য কোনো-সময়ে বা আপনাকে

পা'ন, কোনো-সময়ে বা আপনাকে চা'ন; সেটা বটে একটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। তাই কি তোমার অভিপ্রায়? তুমি কি বলিতে চাও, সত্যের প্রকাশ সাময়িক প্রকাশ? আবার তা'ও বলি, অপ্রকাশের অবস্থায় চাওয়া কতদূর সম্ভবে--সেটাও একটা ভাবিবার বিষয়—বিশেষত প্রতিদিনই যখন দেখিতেছি যে, রাত্রি-কালের প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় অপ্রকাশ যে-সময়ে সর্ব্বেসর্ব্বা হয়, সে সময়ে চাওয়া ধুইয়া-পুঁছিয়া মন হইতে এম্নি সাফ্ সরিয়া পলায় যে, তাহার চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। বলিতে কি—আমার জিজ্ঞাসা রক্তবীজের সহোদর—মরিতে চাহে না কিছুতেই! এক বীরের নিপাত হইল তো অম্নি তার জায়গায় তিন বীর আসিয়া তাল ঠুকিয়া দণ্ডায়মান! তার সাক্ষী :—

নবোত্থিত তিন প্রশ্ন।

(১) চাওয়া-পাওয়া'র একত্র-বাস কিরূপে সম্ভবে?

(২) সত্যের প্রকাশ সাময়িক প্রকাশ, না চিরপ্রকাশ?

(৩) প্রকাশ এবং অপ্রকাশের সহিত চাওয়া-পাওয়া'র কিরূপ সম্বন্ধ?

উত্তর। তোমার তিন প্রশ্নের উত্তর এক সঙ্গে দিতে হইলে, তাহা আমার ন্যায় একমুখো ব্যক্তির সাধ্যের অতীত; কিন্তু, তা বলিয়া, তোমার হতোদ্যম হইবার বিশেষ কোনো কারণ দেখি না; কেন না এটা আমি বেস্ জানি যে, ঐ তিন প্রশ্নের একটির রীতি-মত মীমাংসা হইলেই, সেইসঙ্গে আর-দুইটির মীমাংসা আপনা আপনি হইয়া যাইবে, তা বই, তাহার জন্য স্বতন্ত্র উপায়-চেষ্টার প্রয়োজন হইবে না। তিনটির মধ্যে কোন্‌টি তোমার মুখ্য জিজ্ঞাস্য—সেইটি আমাকে বলো, তাহা হইলে তোমার জিজ্ঞাসার

রসদ যোগানো আমাকর্ত্তৃক যতদূর সম্ভবে তাহার আমি বিধিমতে চেষ্টা দেখিব।

প্রশ্ন। বলিতেছিলাম যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাওয়া না হয়,- ততক্ষণ পর্য্যন্তই চাওয়া বাহির হইতে থাকে—পাওয়া হইয়া চুকিলেই চাওয়া বন্ধ হয়। তাই বলি যে, চাওয়া এবং পাওয়া একত্রে বাস করিবে কেমন করিয়া—বাঘেগরুতে একঘাটে জল পি'বে কেমন করিয়া?

উত্তর। এইমাত্র তুমি তোমার বাগানের মালীকে ডাকিয়া আম্র চাহিলে। তুমি যদি ইহার পূর্ব্বে কোনোকালে আম্রের আস্বাদ না পাইতে, তাহা হইলে কখনই তুমি আম্র চাহিতে না। তবেই হইতেছে যে, চাওয়া বলিয়া যে একটি ব্যাপার, তাহা পাওয়া'রই রেস্ অর্থাৎ অনুতান বা লেজুড়। আবার, একটু পূর্ব্বে তুমি যখন তোমার বাগানের মালঞ্চ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলে, আর, সেই সুযোগে আমি যখন দিব্য একটি ফুটন্ত গোলাপফুল দেখিয়া তাহা তুলিবার জন্য হাত বাড়াইলাম, তুমি তৎক্ষণাৎ আমার হাত টানিয়া ধরিয়া বলিলে, "কর কি—কর কি! উহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমার মন বলিতেছে 'চিরজীবী হইয়া বাঁচিয়া থাকো!' আর, তুমি কি না স্বচ্ছন্দে উহাকে বধ করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিতেছ—তুমি দেখিতেছি জল্লাদের শিরোমণি!" ফুলের সৌন্দর্য্য সেই যে তুমি জ্ঞানে উপলব্ধি করিলে, জ্ঞানের সেই উপলব্ধিক্রিয়ার নামই পাওয়া, আর, আমি ফুলের গাত্রে হস্তক্ষেপ করিবামাত্র তোমার প্রাণ সেই যে কাঁদিয়া উঠিল, প্রাণের সেই ক্রন্দনের নামই ফুলটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাওয়া। যে সময়ে তুমি ফুলটিকে তোমার চক্ষের সম্মুখে পাইয়াছিলে, সেই সময় হইতেই তুমি চাহিতেছিলে যে, ফুলটি চিরজীবী

হইয়া বাঁচিয়া থাকুক্; একই অভিন্ন সময়ে, তোমার জ্ঞানের পাওয়া এবং প্রাণের চাওয়া পরস্পরের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া হরিহরাত্মা হইয়া গিয়াছিল;—তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে ব্যাঘ্রমৃগের সম্বন্ধ। তোমার দৃষ্টিতে তুমি যেখানে দেখিতেছ ব্যাঘ্রমৃগের সম্বন্ধ, আমার দৃষ্টিতে আমি সেখানে দেখিতেছি পুরুষপ্রকৃতির সম্বন্ধ বা জ্ঞানপ্রাণের সম্বন্ধ। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—জ্ঞান সব-চেয়ে ভালবাসে কাহাকে? জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিলে জ্ঞান কি বলে? জ্ঞান বলে—প্রাণতুল্য ভালবাসাই ভালবাসার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। তাহা যখন সে বলে, তখন তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জ্ঞান প্রাণকে যেমন ভালবাসে, এমন আর কাহাকেও নহে। প্রাণ আবার তেম্নি-ভালবাসে জ্ঞানকে। জ্ঞান একমুহূর্ত্ত চক্ষের আড়াল হইলে প্রাণ দশদিক্ অন্ধকার দেখে। জ্ঞান ছাড়িয়া পলাইলে প্রাণের নাড়ি ছাড়িয়া যায়। ভালবাসা যদি-চ বস্তু একই, তথাপি জ্ঞানের ভালবাসা এবং প্রাণের ভালবাসার মধ্যে একপ্রকার অভেদ-ঘ্যাঁসা প্রভেদ আছে, আর, সে যে প্রভেদ, তাহার গোড়া'র কথা হ'চ্চে প্রতিযোগিতা অর্থাৎ পাশ্চাত্যবিজ্ঞানশাস্ত্রে যাহাকে বলে Polarity কিনা মিথুনীভাব। পুরুষ যেভাবে স্ত্রীকে ভালবাসে, জ্ঞান সেই-ভাবে প্রাণকে ভালবাসে, আবার, স্ত্রী যেভাবে পুরুষকে ভালবাসে, প্রাণ সেইভাবে জ্ঞানকে ভালবাসে। রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, নবোদিত সূর্য্য যেভাবে পদ্মিনীর প্রতি চক্ষু উন্মীলন করে, নবোদিত জ্ঞান সেইভাবে প্রাণের প্রতি চক্ষু উন্মীলন করে; তার সাক্ষী—মানুষ্যাবতারের আদিমবয়সে পৃথিবীতে জ্ঞানের যখন সবে-মাত্র অরুণোদয় দেখা দিয়াছিল, তখন জ্ঞানের কার্য্যই ছিল—প্রাণ কিসে ভাল থাকে—অহোরাত্র কেবল তাহারই পন্থায়

ঘুঁরিয়া বেড়ানো। আবার, সুরভি নিশ্বাস ছাড়িয়া পদ্মিনী যেভাবে নব বিভাকরের প্রতি হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে, প্রাণ সেইভাবে জ্ঞানের প্রতি হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করে;—জ্ঞানকে পাইলেই প্রাণ তাহার নিকটে আপনার নিগূঢ় অন্তরের কথা খোলে—বিনা বাক্যে অবশ্য, কেন না, জ্ঞান শ্রোতা নহে—জ্ঞান দ্রষ্টা; জিজ্ঞাসা বটে শ্রোতা, আর, সেইজন্য তাহার সাঙ্কেতিকচিহ্ন কর্ণাকৃতি (?) এইরূপ;—ফলে, জ্ঞানের চক্ষে আকারইঙ্গিতই বাক্যের চূড়ান্ত। একই আম্রের অঙ্কুর যেমন আঁটির দলযুগলের জোড়ের মাঝখান হইতে দুই দিকের দুই ডাল হইয়া ছট্‌কিয়া বাহির হয়, একই ভালবাসা তেম্‌নি পুরুষপ্রকৃতির দাম্পত্যবন্ধনের মাঝখান হইতে দুইভাবের দুইতরো ভালবাসা হইয়া ছট্‌কিয়া বাহির হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, স্ত্রীর প্রতি পুরুষের ভালবাসাই বা কি-ভাবের ভালবাসা, আর, পুরুষের প্রতি স্ত্রীর ভালবাসাই বা কি-ভাবের ভালবাসা? যখন দেখিতেছি যে, স্বামী নববিবাহিতা স্ত্রীকে "তুমি আমার ভব-জলধি-রত্ন" বলিয়া অধিকার করে, তখন তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে স্বামীর ভালবাসা অধিকার-প্রধান—স্বামিত্ব-প্রধান—পাওয়া-প্রধান; পক্ষান্তরে, যখন দেখিতেছি যে, স্ত্রী অকথিত ভাষায় "আমি তোমারই" বলিয়া একান্ত অধীনা-ভাবে স্বামীর আশ্রয় যাচ্ঞা করে, তখন তাহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, স্ত্রীর ভালবাসা অধীনতা-প্রধান—চাওয়া-প্রধান, আর, চাওয়া মুখ খুলিতে পারে না বলিয়া লজ্জা-প্রধান। এখন দেখিতে হইবে এই যে, পাওয়া বা অধিক্রিয়া বা উপলব্ধিক্রিয়া জ্ঞানের যেমন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, চাওয়া বা অভাবজ্ঞাপন বা ক্রন্দন প্রাণের তেম্‌নি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। পুরুষের প্রতি স্ত্রীর যেরূপ চাওয়া-

প্রধান ভালবাসা, তাহা প্রাণঘ্যাঁসা-মনের ভালবাসা—সংক্ষেপে প্রাণের ভালবাসা; আর, স্ত্রীর প্রতি পুরুষের যেরূপ পাওয়া-প্রধান ভালবাসা তাহা জ্ঞানঘ্যাঁসা-মনের ভালবাসা—সংক্ষেপে জ্ঞানের ভালবাসা। স্ত্রীর প্রাণের ভালবাসা এক-প্রকার জ্ঞানশূন্য অহেতুক ভালবাসা; রাধাকে তাই কবিরা বলেন "উন্মাদিনী রাধা"। পক্ষান্তরে, পুরুষের জ্ঞানের ভালবাসা একপ্রকার রত্নচেনা চোকো'লো ভালবাসা; কৃষ্ণকে তাই কবিরা বলেন "চতুর-চূড়ামণি"। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, "কৃষ্ণকে ভালবাসি জানি না সই আমি কিজন্য" এইরূপ জ্ঞানশূন্য অহেতুক ভালবাসা বড়, না "রাধা মূর্ত্তিমতী প্রেমমাধুরী, তাই আমি রাধার চরণ-কিঙ্কর" এইরূপ চোকো'লো-ধাঁচার সহেতুক ভালবাসা বড়? ইহার উত্তর এই যে রাধার অহেতুক ভালবাসা প্রাণাংশে বড়, কৃষ্ণের সহেতুক ভালবাসা জ্ঞানাংশে বড়। হারজিতের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে,

ভিন্ন জাতির ভিন্ন রীত।
আপন মুলুকে সবার'ই জিত।

ফলকথা এই যে, কৃষ্ণরাধিকার যুগবাঁধা প্রেম এ বলে আমায় ছাখ্, ও বলে আমায় ছাখ্; দুয়েরই মর্য্যাদা নিক্তির ওজনে সমান; যেহেতু জ্ঞানের পাওয়া এবং প্রাণের চাওয়া চথাচথীর ন্যায় সখা-সখী। ভিতরের কথাটি তবে তোমাকে ভাঙিয়া বলি—

প্রাণ হইতে জ্ঞানে পৌঁছিবার মাঝপথে একটি ঘাটি-স্থান আছে, সেইটিই ভালবাসা'র জন্মস্থান। সে স্থানটি হ'চ্চে মন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মন পদার্থটা কি? গঙ্গাজলই যেমন গঙ্গার সারসর্ব্বস্ব, তেমি, মানস বলিয়া যে-একটি মনোবৃত্তি আছে, তাহাই মনের সারসর্ব্বস্ব। মানস, সঙ্কল্প, ইচ্ছা, মন একই। তার সাক্ষী

—"মন নাই" বলিলে বুঝায় ইচ্ছা নাই, "মনে ধরে না" বলিলে বুঝায় ইচ্ছার সঙ্গে মেলে না, "মন যায় না" বলিলে বুঝায় ইচ্ছা হয় না। পৃথিবীর ভূগোল তোমার নখাগ্রে, তাহা আমি জানি; তোমার জানিতে কেবল বাকি মনের ভূগোল; জানা কিন্তু উচিত—বিশেষত তোমার মতো পণ্ডিতলোকের। অতএব প্রণিধান কর—

মন হ'চ্চে মানস-সরোবর বা ইচ্ছা সরোবর, আর, তা'র দুই কূল হ'চ্চে জ্ঞান এবং প্রাণ। মনের যে-জায়গাটি জ্ঞানের কূল ঘেঁসিয়া তরঙ্গিত হয়, মানস-সরোবরের সেই জ্ঞানঘ্যাঁসা কিনারাটি প্রভাবাত্মক বা প্রভুত্বপ্রধান বা পাওয়া-প্রধান ইচ্ছা, সংক্ষেপে ঈশনা; আর, মনের যে-জায়গাটি প্রাণের কূল ঘেঁষিয়া তরঙ্গিত হয়, মানস-সরোবরের সেই প্রাণঘ্যাঁসা কিনারাটি অভাবাত্মক বা অধীনতাপ্রধান বা চাওয়া-প্রধান ইচ্ছা, সংক্ষেপে বাসনা। মুখে সব কথা খোলোসা করিয়া বলিতে গেলে বড্ড বেশী বকিতে হয়, অথচ, বক্তা'র কেবল বকুনিই সার হয়—শুনিবেন যাঁহারা, তাঁহারা ঘড়ি-ঘড়ি স্ব স্ব গৃহের দিকে মুখ ফিরাইতে থাকেন। তাহাতে কাজ নাই। মানস-সরোবরের একখানি ক্ষুদ্র মানচিত্রের (এক-প্রকার চুম্বক চিটে'র) জোগাড় করিয়াছি, তাহা দেখিলেই সরো-বরটি'র কূলকিনারা'র ঠাহর পাইতে তোমার একমুহূর্ত্তেও বিলম্ব হইবে না; অতএব দেখ—

ও-কূল—জ্ঞান

ও-পারের কিনারা-ঈশনা বা পাওয়া-প্রধান ইচ্ছা

মানস-সরোবর বা সঙ্কল্প বা ইচ্ছা বা মন

এ-পারের কিনারা—বাসনা বা চাওয়া-প্রধান ইচ্ছা

এ-কূল—প্রাণ

মানচিত্রে এ যাহা দেখিলে, তাহা যদি বাস্তবিক-মানসসরোবরের সহিত হাতে-কলমে মিলাইয়া দেখিতে চাও, তবে চলো তোমাকে সরোবরটির এ-পার হইতে পাড়ি দিয়া ও-পারে লইয়া যাই, তাহা হইলেই তোমার ধন্দ মিটিয়া যাইবে।

একটু পূর্ব্বে তুমি যখন নিদ্রায় অচেতন ছিলে, তখন তোমার নিশ্বাসপ্রশ্বাস ঘড়ি'র কলের মতো বাঁধানিয়মে চলিতেছিল, ইহাতে আর ভুল নাই। ঘড়ি'র কল'কে তো চালায় জানি ঘড়ি'র স্প্রিঙ্—তোমার নিদ্রাবস্থায় তোমার নিশ্বাসপ্রশ্বাস চালাইতেছিল কে? তোমার প্রাণ অবশ্য। তুমি তো নিদ্রায় অচেতন, আর, আমি সেই সময়ে তোমার শয়নঘরের এককোণে চেয়ারে হ্যালান্ দিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছি; ইতিমধ্যে তোমার নাক ডাকিয়া উঠিল গগনভেদী সপ্তমস্বরে—ডাকিয়া উঠিল অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় এম্নি সহসা যে, আমি চমকিয়া উঠিলাম, আর, সেই মুহূর্ত্তে যে-ছোট-ছেলেটি তোমার পার্শ্বে শুইয়াছিল, তাহার ঘুম ভাঙিয়া যাওয়াতে সে বিছানায় উঠিয়া-বসিয়া ভয়োদ্বিগ্নচিত্তে তোমার

শব্দায়মান নাসিকার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তুমি তো সামান্য ডাক্তার নহ, তুমি মহামহোপাধ্যায় এম-ডি; বলি তাই— সেই বছর-সাতেকের ছেলেটি তোমারই তো ছেলে! অ্যালোপাথিক্ ডাক্তারিবিদ্যায় সে পেট-থেকে-পড়িয়াই পণ্ডিত। সে ভাবিল যে, "বাবার নাকের ছিদ্র দিয়া প্রাণ বাহির হইতে চাহিতেছে—কিছুতেই আমি তাহা হইতে দিব না"; এইরূপ ভাবিয়া ছেলেটি তোমার নাক টিপিয়া ধরিল যতদূর তাহার সাধ্য শক্ত করিয়া। তাহার ফল যাহা হইল, তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি, শ্রবণ কর—

প্রথমে নিদ্রার ভাঙো-ভাঙো অবস্থায় তোমার দুঃস্বপ্নপীড়িত অর্দ্ধস্ফুট মনে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের পথের বাধা সরাইয়া ফেলিবার ইচ্ছার উদ্রেক হইল; আর, সে যে ইচ্ছা, তাহা নিতান্ত অবলা ইচ্ছা—চাওয়া-প্রধান প্রাণঘ্যাসা ইচ্ছা—বাসনা মাত্র। তাহার পরে তুমি ধড়্ফড়্ করিয়া জাগিয়া-উঠিয়া ছেলেটির হাতের কামড়্ হইতে তোমার নাসিকা ছাড়াইয়া লইতে ইচ্ছা করিলে; এবার'কার এ ইচ্ছা প্রভাবাত্মক সবলা ইচ্ছা—পাওয়াপ্রধান জ্ঞানঘ্যাসা ইচ্ছা; ইহারই নাম ঈশনা। যেই তোমার মনে জাগ্রত জ্ঞানের উদয় হইল, সেই-অম্নি ঈশনার পরাক্রমের চোটে ছেলেটির হস্ত হইতে তৎক্ষণাৎ তুমি তোমার বিপন্ন নাসাগ্র টানিয়া-লইয়া ছেলে-বেচারিটিকে এক-ধমকে কাঁদাইয়া ফেলিলে। মানস-সরোবরের এ-কূল হইতে ও-কূলে—প্রাণ হইতে জ্ঞানে— উত্তীর্ণ হইবার পথের ঠিক্-ঠিকানা এই তো তুমি হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া সুনির্ঘাত জানিতে পারিলে। পথ-অতিবাহনের ক্রম-পদ্ধতির বিবরণ এ যাহা তুমি জানিতে পারিলে, তাহা সংক্ষেপে এই—

স্থূল ক্রমপদ্ধতি।

(১) প্রাণ

(২) মন

(৩) জ্ঞান

সবিশেষ ক্রমপদ্ধতি।

(১) প্রাণ

(২)মন { (১॥০) প্রাণঘ্যাসা মন—বাসনা
(৩॥০) জ্ঞানঘ্যাসা মন—ঈশনা }

(৩) জ্ঞান

পূর্ব্বপ্রদর্শিত মানচিত্রখানিতে ক্রমপদ্ধতির অঙ্কচিহ্ন ছিল না। মানস-সরোবরের অমন একখানি সুন্দর নখদর্পণে অসম্পূর্ণতা-দোষ থাকিতে দেওয়া উচিত হয় কি? কোনোক্রমেই না; অতএব দেখ—

মানস-সরোবরের মানচিত্রের

দ্বিতীয় সংস্করণ।

(৩) ও-কূল——জ্ঞান

(৩॥০) পাওয়া-প্রধান জ্ঞানঘ্যাসা মন—ঈশনা

(২) মানস-সরোবর—মন

(১॥০) চাওয়া-প্রধান প্রাণঘ্যাসা মন—বাসনা

(১) এ-কূল—প্রাণ

প্রথমে পাওয়া হইয়াছিল মানস-সরোবরের কূলকিনারা'র সন্ধান, এক্ষণে পাওয়া হইল মানস-সরোবরের এ-কূল হইতে ও-

কূলে পৌঁছিবার ক্রমপদ্ধতির সন্ধান। আর তিনটি বিষয়ের সন্ধান পাইতে এখনো বাকি; সে তিনটি বিষয় হ'চ্চে—(১) ব্যক্তাব্যক্ত-রহস্য, (২) ত্রিগুণ-রহস্য, এবং (৩) দ্বন্দ্ব-রহস্য বা চাওয়া-পাওয়া'র বিচ্ছেদমিলনের ব্যাপার।

ব্যক্তাব্যক্তরহস্য।

যাত্রাকালে পথযাত্রীর পক্ষে দুইটি কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ সমান আবশ্যক্। প্রথমে দেখা চাই—কাজের সামগ্রীগুলি সমস্তই মোট বাঁধিয়া সঙ্গে লওয়া হইয়াছে কি না; তাহার পরে দেখা চাই—যে-সময়ের জন্য যাহা প্রয়োজন, সেই সময়ে তাহা ঝট্‌পট্‌ খুঁজিয়া পাইতে পারিবার মতো সুন্দর প্রণালীতে সমস্ত ব্যবহার্য্য-দ্রব্য গুছাইয়া রাখা হইয়াছে কি না। প্রথম কার্য্যটি (অর্থাৎ মোটবাঁধা-কার্য্যটি) একপ্রকার হইয়া চুকিল মন্দ না—প্রাণ, মন, জ্ঞান, এই তিন বৃহৎ প্যাটরা'র মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পুরিয়া ফ্যালা হইল। এখন, দ্বিতীয় কার্য্যটি (দ্রব্যাদি ভাগ-ভাগ করিয়া সুপ্রণালীতে গুছাইয়া রাখা কার্য্যটি) হইয়া-চুকিলেই নির্ঝঞ্ঝাট হওয়া যায়। তাহাতেই প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বিশাল অরণ্যে যে অগ্নি কোথায় লুকাইয়া থাকে, তাহা জানিতে পারা ভার, দাবানলের আরম্ভকালে সেই অগ্নিই (অরণ্য-দারুর অন্তনিগূঢ় অদৃশ্য অগ্নিই) শাখাগুলা'র ঝুটোপুটি'র উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হইয়া হেথা-হোথা-সেথা ছিন্নছিন্নভাবে ফুটিয়া বাহির হয়; ক্ষণপরে আবার সেই অগ্নিই প্রচণ্ডবেগে সমস্ত অরণ্যের আপাদ-মস্তক অধিকার করিয়া আকাশে জয়পতাকা উড্ডীয়মান করে।

আমাদের মধ্যেও অগ্নি আছে; সে অগ্নি আধ্যাত্মিক অগ্নি; তাহার নাম চেতন।

যে-চেতন আমাদের প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় আমাদের ভিতরে কোথায় লুকাইয়া থাকে, তাহা আমরা জানিতেও পারি না, আমাদের স্বপ্নাবস্থায় সেই চেতনই বাসনাবশে ছিন্নছিন্নভাবে ফুটিয়া বাহির হয়; আবার, আমাদের জাগরণকালে সেই চেতনই আমাদের অন্তঃকরণের আপাদমস্তক অধিকার করিয়া মুক্ত চিদাকাশে ঈশনার জয়পতাকা উড্ডীয়মান করে।

তিন অবস্থার অগ্নি যেমন তিনপ্রকার, তিন অবস্থার চেতনও তেমনি তিনপ্রকার। নিদ্রাবস্থার অব্যক্ত-চেতন কাষ্ঠের অন্তর্নিগূঢ় তাপাগ্নি; স্বপ্নাবস্থার অর্দ্ধস্ফুট-চেতন তপ্তাঙ্গারের গা-ঘঁ্যাসা দাহাগ্নি; জাগরিতাবস্থার সুব্যক্ত চেতন আকাশ-লেলিহমান শিখাগ্নি।

প্রথমাবস্থার অব্যক্ত-চেতনের সংক্ষিপ্ত নাম প্রাণ; মাঝের অবস্থার অর্দ্ধস্ফুট-চেতনের সংক্ষিপ্ত নাম মন; তৃতীয় অবস্থার সুব্যক্ত-চেতনের সংক্ষিপ্ত নাম জ্ঞান।

প্রাণ অব্যক্তসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ঘুমের ঘোরে বাঁধা-পথে চলে। শাস্ত্রে অব্যক্তসংস্কারের নাম আছে রাশি-রাশি; প্রাক্তন-সংস্কার, অদৃষ্ট, নিয়তি, কর্ম্মবিপাকাশয়, এ সব নাম তাহারই নাম; পরন্তু কেহ যদি ঐ সব বিদেশী-সিক্কে ওজনের নামের বোঝা তোমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিয়া তোমার কাছে পারিতোষিক যাচ্ঞা করে, তবে তুমি যে তাহাকে কিরূপ পারিতোষিক প্রদান কর, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে; অতএব তাহাতে কাজ নাই। "সংস্কার" বলিতে কি বুঝায়, তাহা আমরা সকলেই জানি;—উপস্থিত কার্য্য-নির্ব্বাহের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। প্রাণ অব্যক্তসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ঘুমের ঘোরে বাঁধাপথে চলে; মন বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া

কল্পনাস্বপ্নের কাল্পনিক সত্ত্বাতে অবগাহন করে; জ্ঞান ঈশনায় ভর করিয়া দাঁড়াইয়া বস্তুসকলের বাস্তবিক সত্ত্বাতে অবগাহন করে, এক কথায়—সত্যে অবগাহন করে।

তিন অবস্থার তিনপ্রকার অগ্নি শুধু যে কেবল একটার পর আরেকটা পরে-পরে আবির্ভূত হয়, তাহা নহে, পরন্তু একটার পর আরেকটা পরে-পরে আবির্ভূত হইয়া স্তরেস্তরে উপর্য্যুপরি সন্নিবেশিত হয়। দাবানলের প্রজ্বলিত অবস্থার অগ্নির মধ্যে তুমি যদি অনুসন্ধান-দৃষ্টি চালনা কর, তবে সবা'র উপরের স্তরে দেখিবে মুক্ত আকাশে উত্থান করিতেছে প্রজ্বলিত শিখাগ্নি; মাঝের স্তরে দেখিবে কাষ্ঠভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতেছে দাহাগ্নি; নীচের স্তরে ঘুমাইয়া রহিয়াছে দেখিবে দগ্ধাবশিষ্ট ভস্মরাশির অন্তর্নিগূঢ় তাপাগ্নি। তেম্নি আবার তুমি যদি তোমার জাগরিতাবস্থায় সুব্যক্ত-চেতনের ভিতরে উঁকি দিয়া দেখ, তবে উপরের স্তরে রহিয়াছে দেখিবে জ্ঞানের দিবালোকে দেদীপ্যমান ঈশনার জাগ্রত-ভাব; মাঝের স্তরে রহিয়াছে দেখিবে অর্দ্ধস্ফুট-চেতনের সান্ধ্য-চ্ছায়ায় পরিবৃত বাসনার স্বপ্ন; নীচের স্তরে রহিয়াছে দেখিবে প্রাণের অমানিশায় অবগুণ্ঠিত ঘুমন্ত সংস্কার।

সে কথা যা'ক্! তুমি একটু পূর্ব্বে যাঁহার কথা বলিতেছিলে —তোমার সেই পুরাতন বন্ধু দেবদত্ত কি সরেস লোকই ছিলেন! আজিকের বাজারে তাঁহার মতো সদাশয় লোক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি আজ বিশবৎসর হইল তোমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সেই-যে-সেই দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত ঘুণাক্ষরেও তাঁহার কোনো সংবাদ তুমিও পাও নাই, আমিও পাই নাই। তুমি তো জানি সহরের মধ্যে একজন সেরা চিত্রকর; তোমার মন থেকে দেবদত্তের একখানি

ছবি যদি তুমি আমাকে আঁকিয়া দিতে পার, তবে তোমাকে আমি কত যে ধন্যবাদ দিই, তাহা বলিতে পারি না; কেন না, দেবদত্ত আমারও পরম বন্ধু ছিলেন। তাহা তুমি কিছুতেই পারিয়া উঠিবে না, তাহা জানি; তাহা জানিয়াও, এটা আমি সুনির্ঘাত বলিতে পারি যে, দেবদত্তের দিব্য একখানি ছবি তোমার প্রাণের চোর-কুটুরীর ছবির আল্‌মারিতে গুছানো রহিয়াছে; আর, সে যে ছবি তাহা দেবদত্ত বিশবৎসর পূর্ব্বে যেমনটি ছিলেন, তাহারই মতো অবিকল। তার সাক্ষী—এইমাত্র তুমি আমাকে বলিলে যে, গতরাত্রের স্বপ্নে দেবদত্তকে দেখিয়াছ—ঠিক্ সেই বিশবৎসর পূর্ব্বের দেবদত্ত যেন তোমার সম্মুখে মূর্ত্তিমান্। তোমার নিদ্রিত অবস্থায় ব্যাপারটা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বুঝিতেই পারা যাই-তছে;—প্রাণের অব্যক্তসংস্কার মনের বাসনাতে সোয়ার হইয়া কল্পনার রঙ্গভূমিতে দেবদত্তবেশে সাজিয়া বাহির হইয়াছিল তা' বই আর কিছুই না।

এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে তুমি যদি জানালার ফাঁক দিয়া হঠাৎ দেখ যে, একটি অর্দ্ধপ্রবীণগোচের পথযাত্রী বৃষ্টির ভয়ে রাস্তার ও-ধারের ঐ ময়রার দোকানটার দ্বারের গোড়ায় দাঁড়াইয়া বৃষ্টি-ধরিয়া যাওনের অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে, তিনি যদি তোমার সেই পুরাতন বন্ধু দেবদত্ত হ'ন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার মন বলিবে—"ভদ্রলোকটি না-জানি কে?" ইহারি নাম জিজ্ঞাসা। তাহার পরে তোমার গতরাত্রের স্বপ্নের প্রফুল্ল যুবা সম্মুখস্থিত বিমর্ষভাবাপন্ন অর্দ্ধপ্রবীণ ব্যক্তিটির সহিত মিশিয়া যাইতে চেষ্টা করিবে, আর, সে চেষ্টার প্রথম উদ্যমে তুমি দেবদত্তকে চেন' চেন' করিয়াও চিনিতে না পারিয়া ক্রমাগতই তাঁহার মুখাকৃতি পর্য্য-বেক্ষণ করিতে থাকিবে; ইহারই নাম অনুসন্ধান। তাহার পরে

তুমি সেই অর্দ্ধপ্রবীণ ব্যক্তিটির মুখচক্ষুর আকারপ্রকার-ভাবভঙ্গীর ভিতরে কয়েকটি পূর্ব্বপরিচিত অভিজ্ঞানচিহ্ন খুঁজিয়া পাইয়া আচম্বিতে বলিয়া উঠিবে—"এ কি! দেবদত্ত যে!" ইহারই নাম অনুমান। এই যে তোমার মনোমধ্যে জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান, এবং অনুমান একটার পর-আর একটা পরে-পরে আসিয়া স্বস্ব কার্য্যে কোমর বাঁধিয়া বসিয়া গেল—এ তো দেখিতেছি একপ্রকার গয়িবী চাল; যে-ওস্তাদ পিছনে থাকিয়া চাল চালিতেছে, তাহাকে তো কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছি না; খুঁজিয়া পাইব কেমন করিয়া? সে যে অব্যক্ত-সংস্কার; অব্যক্তসংস্কার আপনাকে ধরিতে ছুঁইতে দিবার পাত্র নহে; তাহা কেবল ফলেন পরিচীয়তে।

গতরাত্রের স্বপ্নে তোমার মনোমধ্যে জিজ্ঞাসাও ছিল না—অনুসন্ধানও ছিল না। গতরাত্রে শুদ্ধ-কেবল বাসনার মন্ত্রের চোটে অর্দ্ধস্ফুট-চেতনের ঝাপ্‌সা আলোকে দেবদত্তের প্রতিমূর্ত্তি তোমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দেখা দিয়াছিল। বাসনা অব্যক্তসংস্কারের একধাপ-উপরের স্তরে নবপ্রসূত পক্ষিশাবকের ন্যায় ক্ষণে উড়িয়া উপরে ওঠে, ক্ষণে নীচে পড়িয়া গিয়া ভূতলে অবলুণ্ঠন করে; তাহা একদণ্ডও স্থির হইয়া থাকে না, ক্রমাগতই উড়ুউড়ু করে। বাসনা প্রাণঘ্যাঁসা ইচ্ছা বা প্রাণঘ্যাঁসা মন। গতরাত্রের স্বপ্নে তোমার অর্দ্ধস্ফুট-চেতন শুদ্ধ-কেবল বাসনাতে ভর করিয়া সম্মুখবর্ত্তী বিষয়ের কাল্পনিক সত্তায় অবগাহন করিয়াছিল। আজ তুমি জাগরিতাবস্থার সুব্যক্ত-চেতনের দিবালোকে সুপ্রত্যক্ষ বিষয়ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা এবং অনুসন্ধান চালনা করিয়া জানিতে পারিলে যে, দেবদত্ত তোমার সম্মুখে বিরাজমান। আজ্‌কে'কার এই যে তোমার জাগ্রতভাবের জিজ্ঞাসা এবং অনুসন্ধান, ইহার ভিতরে ঈশনার হস্ত স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ঈশনা আর কিছু না—জ্ঞানঘ্যাঁসা ইচ্ছা বা জ্ঞানঘ্যাঁসা

মন। গতরাত্রে তোমার মনের বাসনার নীচের স্তরে প্রাণের অব্যক্তসংস্কার্ তলে-তলে কার্য্য করিয়াছিল; আজ তোমার জ্ঞানের ঈশনা সর্ব্বোপরি কর্ত্তা হইয়া বিরাজমান, আর জ্ঞানের সেই যে ঈশনা তাহার নীচের স্তরে মনের বাসনা এবং তাহারো নীচের স্তরে প্রাণের অব্যক্তসংস্কার তলে-তলে কার্য্য করিয়া তোমার জ্ঞানের আনুমানিক সিদ্ধান্তে বলসঞ্চার করিতেছে। অতএব তিনটি বিষয় সুনিশ্চিত; সে তিনটি বিষয় এই যে, (১) তোমার জাগরিতাবস্থায়—জ্ঞান, মন এবং প্রাণ, তিনই একজোট হইয়া কার্য্য করে; (২) স্বপ্নাবস্থায়, মন এবং প্রাণ একজোট হইয়া কার্য্য করে; (৩) সুষুপ্ত অবস্থায় প্রাণ একাকী কার্য্য করে। যেমন রাজা এবং সেনা একজোট হইয়া যুদ্ধ করিতেছে বলিলেই বুঝায় যে, রাজা, সেনাপতি এবং সেনা, তিনই একজোট হইয়া যুদ্ধ করিতেছে, তেম্নি জ্ঞানবান্ জীবের জাগরিতাবস্থায় জ্ঞান এবং প্রাণ একজোট হইয়া কার্য্য করিতেছে বলিলেই বুঝায় যে, জ্ঞান, মন এবং প্রাণ, তিনই একজোট হইয়া কার্য্য করিতেছে। তা ছাড়া, যেমন রাজা এবং সেনাপতি দুইকে একসঙ্গে ধরিয়া বলা যাইতে পারে—সৈন্যের অধিনায়ক, তথৈব, সেনা এবং সেনাপতির অধীনস্থ সর্দারদিগকে একসঙ্গে ধরিয়া বলা যাইতে পারে—সেনা; সেইরূপ-ন্যায়ে—স্থলবিশেষে আবশ্যক হইলে জ্ঞান এবং জ্ঞানঘ্যাঁসা মন দুইকে একসঙ্গে ধরিয়া সংক্ষেপে বলা যাইবে—জ্ঞান; তথৈব, প্রাণ এবং প্রাণঘ্যাঁসা মন দুইকে একসঙ্গে ধরিয়া সংক্ষেপে বলা যাইবে—প্রাণ। এরূপস্থলে জ্ঞান এবং প্রাণ একজোট হইয়া কার্য্য করিতেছে বলিলেই জ্ঞান এবং প্রাণের মাঝের জায়গায় মনও যে কার্য্য করিতেছে, তাহা আপনা-আপনিই বুঝাইয়া যাইবে, আর, তাহা হইলেই স্বতন্ত্ররূপে মনের নামোল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

ক্ষেত্র দেখ :—

সংক্ষিপ্ত নামকরণ।

জ্ঞান	জ্ঞান		
	ঈশনা	মন (উহ্য)	
প্রাণ	বাসনা		
	প্রাণ		

আপাতত এখানে আমি মাঝের অঞ্চলের মনের ব্যাপারটিকে ঐরূপে উহ্য রাখিয়া—বলিতে চাই এই যে, আমাদের জাগরিতাবস্থায়, জ্ঞান এবং প্রাণ কর্ত্তাগৃহিণীর ন্যায় একজোট হইয়া একত্রে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের পরিচালনাকার্য্যে নিযুক্ত থাকে; পরন্তু নিদ্রাবস্থায় জ্ঞানের অনুপস্থিতিকালে প্রাণ একাকী ঐ কার্য্য সুনির্ব্বাহ করে। তোমার এই যে নিশ্বাসপ্রশ্বাস ঘড়ি'র কলের ন্যায় বাঁধা-নিয়মে অষ্টপ্রহর চলিতেছে—তাহা চালাইতেছে কে? তোমার প্রাণেরই তাহা কাজ, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। এটাও কিন্তু দেখিতেছি যে, তোমার প্রাণের সে যাহা কাজ, তাহার উপরে তোমার জ্ঞানের বিলক্ষণ কর্ত্তৃত্ব চলে; দেখিতেছি যে, তুমি সজ্ঞানভাবে নিশ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করিতেও পারো, কমাইতে-বাড়াইতেও পারো, ইচ্ছামাত্রেই। এইজন্যই আমি বলিতেছি যে, যেমন কর্ত্তাগৃহিণী উভয়ে একজোট হইয়া ঘরসংসার চালা'ন, তেম্‌নি জ্ঞান এবং প্রাণ উভয়ে একজোট হইয়া তোমার নিশ্বাসপ্রশ্বাস চালাইতেছে। আবার, এটাও দেখিতেছি যে, কার্য্যপ্রণালী দোঁহার দুইরূপ। যেমন—বাঁধানিয়মে ছোট-ছোট ছেলেদের মানুষ করিয়া তোলা গৃহিণীরই কাজ, তা বই, কর্ত্তা সে কার্য্যে নিতান্তই অপটু; তেম্‌নি বাঁধানিয়মে অষ্টপ্রহর নিশ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা করা প্রাণেরই কাজ; তা বই, জ্ঞান তাহাতে নিতান্তই অপটু। পক্ষান্তরে

যেমন—ছেলেদের শিক্ষার জন্য নূতন কোনোপ্রকার বৈজ্ঞানিক-নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে কর্ত্তাই তাহা পারেন, তা বই, গৃহিণী তাহাতে নিতান্তই অপটু, তেম্‌নি নিশ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করিয়া কুম্ভক করিতে হইলে, অথবা নিশ্বাসপ্রশ্বাস কমাইয়া-বাড়াইয়া রেচক-পূরক করিতে হইলে জ্ঞানই তাহা পারে, তা বই প্রাণ তাহাতে নিতান্তই অপটু। কিন্তু জ্ঞান যতই কেন প্রাণের উপরে কর্ত্তৃত্ব করুক্ না, প্রাণকে সে চটাইয়া প্রাণের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে কোনো কার্য্যই করিতে পারে না। প্রাণায়াম সাধন করিবার সময় জ্ঞান ধীরে ধীরে প্রাণকে বশ করিয়া আপনার অভিপ্রেত পথে বাগাইয়া আনে, তা বই, প্রাণকে তুচ্ছতাচ্ছীল্যও করে না আর প্রাণের উপরে যথেচ্ছ বলপ্রকাশও করে না। জ্ঞান সবসময়েই প্রাণের সহিত সদ্ভাবে মিলিয়া কার্য্য করে,—প্রাণের সহিত আড়াআড়ি করিয়া কোনো কার্য্যই করে না। জ্ঞান যখন ঈশনা খাটাইয়া প্রাণায়াম সাধন করে তখন প্রাণ জ্ঞানকে আপনার বাঁধা-পথের বেশী বাহিরে যাইতে দেয় না। প্রাণ যেমন কতকমাত্রা জ্ঞানের অভিপ্রায়ের সঙ্গে গোড় দিয়া চলে, জ্ঞানও তেম্‌নি কতকমাত্রা প্রাণের অভিপ্রায়ের সঙ্গে গোড় দিয়া চলে, আর, উভয়ের সুরূপে চলিবার কারণ শুদ্ধ-কেবল পরস্পরের প্রতি মনের ভালবাসা; কেননা মন জ্ঞানপ্রাণের মধ্যস্থস্বরূপ। জ্ঞান এবং প্রাণের মধ্যে কোনো সূত্রে দাম্পত্যকলহ বাধিলে মন মাঝে পড়িয়া বিবাদ মিটাইয়া দিতে চেষ্টা করে। ফলে, জ্ঞান এবং প্রাণের মধ্যে কলহ যাহা সময়ে-সময়ে বাধিতে দেখা যায়, তাহা হরগৌরীর কোন্দল বই আর কিছুই নহে। জ্ঞানবান্ জীবের জাগরিতাবস্থায় জ্ঞান এবং প্রাণ উভয়ে একজোট হইয়া ঘরসংসার করে—এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু নিদ্রাবস্থায় কি হয়, সেটাও দেখা চাই।

সুব্যক্তচেতন যখন শ্রমক্রমে অবসন্ন হইয়া ঈশনা গুটাইয়া লইয়া অব্যক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তখন সে প্রাণের হস্তে চাবির গোছা ফেলিয়া-দিয়া দিব্য আরামে নিদ্রা যায়। জ্ঞান যখন নিদ্রায় ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়, তখন মন জ্ঞানকে বলিতে পারে যে, "তুমি হ'চ্চ ঘরের কর্ত্তা; ঘরের কর্ত্তা ঘরে না থাকিলে ঘরের দশা হইবে কি?" তা যদি বলে, তবে জ্ঞান তাহার উত্তর দিবে এই যে, "কোনো চিন্তা নাই—ঘরে প্রাণ রহিলেন; আমার থাকাও যা, আর, প্রাণের থাকাও তা, একই; গৃহিণী গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তুমি কি তা জাঁনো না!" প্রাণের প্রতি জ্ঞানের কি অগাধ বিশ্বাস! এম্নি অগাধ বিশ্বাস যে, তুমি যদি বলো "প্রাণ অচেতন", তবে জ্ঞান তোমার সে কথায় কখনই সায় দিবে না; জ্ঞান বলিবে যে, "প্রাণ আমার দ্বিতীয় আপ্নি—প্রাণকে অচেতন বলাও যা, আর, আমাকে অচেতন বলাও তা', একই।" প্রকৃত কথা এই যে; প্রাণ অচেতন নহে; প্রাণ অব্যক্ত-চেতন! চেতনের অব্যক্ত অবস্থার নামই নিদ্রাবস্থা; অব্যক্ত-চেতনের নামই নিদ্রা, আর তাহারই আরেক নাম প্রাণ। নিদ্রা প্রাণই! ইংলণ্ডের ডুবুরী কবি কি বলিতেছেন, শ্রবণ কর:—

" * * * The innocent sleep,
Sleep that knits up the ravelled sleeve of care,
Death of each day's life, sore labour's bath,
Balm of hurt minds, great nature's second course,
Chief nourisher in life's feast.

নির্দ্দোষ নিদ্রা! ভারোদ্বিগ্ন কর্ম্মধন্দা'র গলিতস্খলিত বাহুচ্ছদ*

* জামার আস্তিন। know এবং জ্ঞ (gan) যেমন একেরই সন্তান, knit এবং গাঁথা (=গ্রন্থন) এ দুই শব্দেরও বোধ হয় তেম্নি এক কুলে জন্ম।

সে যে নূতন করিয়া গাঁথিয়া তোলে! দৈনিক জীবনের দৈনিক মৃত্যু! শ্রমপীড়া'র শান্তিবারি! ব্যথিত চিত্তের ধন্বন্তরি! মহা-প্রকৃতির দ্বিতীয় গতিপর্য্যায়! জীবনের ভোগোৎসবের বলপুষ্টি-প্রদায়িনী সেরা-ভোগের সামগ্রী!"

শুনিলে কবিবাক্য! নিদ্রা দৈনিক মৃত্যু বটে, কিন্তু মৃত্যু সে সাক্ষাৎ প্রাণ! পূর্ণিমা-রজনী যেমন জ্যোৎস্নার গুণে জ্যোৎস্না-ময়ী, অব্যক্তচেতনা নিদ্রা তেম্নি প্রাণের গুণে প্রাণময়ী।

চেতনের ব্যক্তাব্যক্তরহস্য যাহা আমরা আমাদের আপনাদের মধ্যে দেখিতে পাই, তাহাই আমি এতক্ষণ ধরিয়া বিবৃত করিলাম।

আমরা দেখিলাম যে, আমাদের আপনাদের ভিতরে যে চেতন আছে, তাহা বস্তু একই; সেই একই চেতন যখন আপনার অব্যক্ত অবস্থায় সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া ঘুমের ঘোরে বাঁধা-নিয়মে বাঁধা-পথে চলিতে থাকে, তখন তাহার নাম হয় প্রাণ; তাহা যখন আপনার অর্দ্ধস্ফুট অবস্থায় বাসনায় ভর করিয়া কল্পনা-স্বপ্নের কাল্পনিক সত্তায় অবগাহন করে, তখন তাহার নাম হয় মন; আবার, যখন তাহা আপনার সুব্যক্ত অবস্থায় ঈশনাতে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া বস্তুসকলের বাস্তবিক সত্তায় অবগাহন করে, তখন তাহার নাম হয় জ্ঞান।

এটাও দেখিলাম যে, জ্ঞানের সুব্যক্ত অবস্থার নামই জাগ-রিতাবস্থা; জ্ঞানের অর্দ্ধস্ফুট অবস্থার নামই স্বপ্নাবস্থা; জ্ঞানের অব্যক্ত অবস্থার নামই নিদ্রাবস্থা। চাহিয়া দেখ:—

আস্তিন গাঁথিয়া তোলা, আর, আস্তিন সেলাই করিয়া তোলা, এ দুই কথার ভাবার্থ একই। কিন্তু মোজা প্রভৃতি যেরূপে তৈয়ারি করা হয়, তাহা এক প্রকার গ্রন্থন-ক্রিয়া—সীবন-ক্রিয়া নহে (সেলাই নহে)। গেঞ্জিফরাকের আস্তিনও সেইভাবে গাঁথিয়া তোলা হয়।

চেতন	নাম	অবস্থা
সুব্যক্ত	জ্ঞান	জাগরণ
অর্দ্ধব্যক্ত	মন	স্বপ্ন
অব্যক্ত	প্রাণ	সুষুপ্তি

আর একটি রহস্য দেখিলাম এই যে, চেতনের সুব্যক্ত অবস্থায় (অর্থাৎ জ্ঞানবান্ জীবের জাগরিতাবস্থায়) তিন অবস্থার চেতনই একত্রে কার্য্য করে, উপরের স্তরে জ্ঞান কার্য্য করে; মাঝের স্তরে মন কার্য্য করে, নীচের স্তরে প্রাণ কার্য্য করে, সবাই একজোট হইয়া কার্য্য করে, কেহই স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করে না। তবেই হইতেছে যে, আমাদের জাগরিতাবস্থার মধ্যেও সুষুপ্তি, স্বপ্ন এবং জাগরণ, তিনই রহিয়াছে; প্রাণাধিষ্ঠিত অব্যক্ত-সংস্কারের সুপ্তভাব রহিয়াছে; মনোধিষ্ঠিত বাসনার স্বপ্ন রহিয়াছে; জ্ঞানাধিষ্ঠিত ঈশনার জাগ্রতভাব রহিয়াছে।

ব্যক্তাব্যক্তরহস্য এ যাহা দেখা গেল, ইহার সঙ্গে আরেকটি রহস্য জড়ানো রহিয়াছে; সেটা হ'চ্চে ত্রিগুণরহস্য; এ রহস্যটিরও অন্ধিসন্ধি ভেদ করা আবশ্যক।

ত্রিগুণরহস্য।

পৃথিবীর দুই প্রদেশে দুই তত্ত্ব বিজ্ঞানের চূড়াস্থানীয় মহাতত্ত্ব বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ; পাশ্চাত্যপ্রদেশে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব এবং প্রাচ্যপ্রদেশে ত্রিগুণতত্ত্ব। দোঁহার মধ্যে প্রামাণিক বলবত্তার কিরূপ

ইতরবিশেষ, তাহা জানিতে পারা কঠিন নহে। একের গোটাদুই ললাটচিহ্নের সহিত অপরের গোটাদুই ললাটচিহ্ন জোঁকা দিয়া মিলাইয়া দেখিলেই তাহা জিজ্ঞাসুব্যক্তির জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। অতএব দেখা য'াক্।

মাধ্যাকর্ষণের বলবত্তা স্থূলভূতের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ। স্থূলভূতের গণ্ডির এক-পা বাহিরে যেখানে ঈথরসমুদ্র সূর্য্যচন্দ্র-তারকার করাঘাতে মৃদঙ্গধ্বনির ন্যায় তালে-তালে তরঙ্গিত হইতেছে, সেখানে (অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতের অধিকারক্ষেত্রে) মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব হালে পানি পায় না। পক্ষান্তরে, ত্রিগুণতত্ত্বের বলবত্তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আপদমস্তক এবং অন্তরবাহির জুড়িয়া সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। আবার, কাঙালের কথা যেমন বাসী হইলেই ফলে, ধনোন্মত্ত ব্যক্তির কথা তেমি বাসী হইলেই ফাঁসিয়া যায়। কোন্ দিন কোন্ আবিষ্কর্ত্তা মাধ্যাকর্ষণের পুরাতন মত উল্টাইয়া-দিয়া কোন্ অশ্রুত-পূর্ব্ব নূতন মত বাহির করিবেন—তাহা কেহই জানে না; তখন হয় তো রাজ্যসুদ্ধ* সবা'রই মুখ হইতে এরূপ এক নূতন বুলি বাহির হইতে থাকিবে যে, মাধ্যাকর্ষণ একপ্রকার চুম্বক আকর্ষণ, অথবা তাহা একপ্রকার তৈজস-ব্যাপার বা বৈদ্যুতিক-ব্যাপার বা ঐথরিক-ব্যাপার। পক্ষান্তরে, ত্রিগুণতত্ত্ব যদি উল্টাইবার হইত, তবে এত-দিনে উল্টাইয়া গিয়া মৃত্তিকাগর্ভে বিলীন হইয়া যাইত। তাহা হইতে পারে না এইজন্য—যেহেতু ত্রিগুণতত্ত্বের উপদেষ্ট্রী প্রকৃতিমাতা স্বয়ং; চন্দ্রসূর্য্য যতদিন না উল্টায়, ততদিন তাহা উল্টাইবে

---

* সংস্কৃত 'সার্দ্ধং' হইতে প্রাকৃত 'সুদ্ধ' জন্মলাভ করিয়াছে। "সার্দ্ধং" কিনা সহিত। "সর্ব্বসুদ্ধ" কিনা সর্ব্বসমেত। "শুদ্ধ-কেবল" বা "শুধু-কেবল"—এ শুদ্ধের শ তালব্য শ; এ-শুদ্ধের অর্থ বিশুদ্ধ বা অমিশ্র, ও-সুদ্ধের অর্থ সমেত বা সহিত; প্রভেদ দ্রষ্টব্য।

না—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও। মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব দুই নৌকায় পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—এক নৌকা পরীক্ষা, আর-নৌকা কল্পনা। পক্ষান্তরে, ত্রিগুণতত্ত্বের মধ্যে কোনোপ্রকার কল্পনার গোঁজামিলন নাই—কৃত্রিম কারীকুরি নাই; তাহা ঝরঝরে পরিষ্কার সাঁচা সামগ্রী। ত্রিগুণতত্ত্বের ভিতরের খবর যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের চক্ষে তাহা কল্পনার স্বপ্ন বই আর কিছুই না। যাঁহাদের চক্ষে আপাতদর্শিতার ঘুমের ঘোর অষ্টপ্রহর লাগিয়া আছে, তাঁহাদের চক্ষে তাহা স্বপ্ন তো বটেই; কিন্তু আমি দেখাইব যে, অপরের চক্ষে ঠিক্ তাহার বিপরীত; দেখাইব যে, জাগ্রৎ-জ্ঞানের চক্ষে তাহা একটা কড়াক্কড় নিক্তির ওজনের প্রামাণিক তত্ত্ব—খাঁটি বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব। অতএব প্রণিধান কর—

আমাদের দেশের একটী প্রাচীন বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধার সহিত মনোনিবেশ করিয়া তোমাকে আমি দেখিতে বলিতেছি এই যে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সত্ত্ব, রজো এবং তমো †, এই তিন গুণের ক্রীড়াক্ষেত্র।

---

† বিষদাঁত-ভাঙা সর্পের যেমন ফোঁস্-কার্য্য শোভা পায় না, বঙ্গভাষায় তেম্নি শব্দের অন্তস্থিত বিসর্গের উচ্চারণ শোভা পায় না। এ কথাটি পণ্ডিতেরা বোঝেন না যদি-চ, কিন্তু আর সবাই বোঝে। কোনো দরিদ্রসন্তান যদি রাজার কৃপায় সহসা ধন-ঐশ্বর্য্যে স্ফীত হইয়া-উঠিয়া ধরা'কে সরা-জ্ঞান করিতে থাকে, তবে লোক বলে "উঁহার তমো হইয়াছে।" বাল্যকালে আমি একজন অর্দ্ধ-কথকের মুখে শুনিয়াছিলাম "অশ্বত্থামা হতো ইতি গজো"। আসল সংস্কৃত হ'চ্চে "অশ্বত্থামা হতঃ—ইতি গজঃ"; আর, আসল উচ্চারণ হ'চ্চে "অশ্বত্থামা হতহ্—ইতি গজহ্।" "হত" অপেক্ষা হতো হতহ্ শব্দের সহিত বেশী মিল খায়, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। এরূপস্থলে পণ্ডিতানুমোদিত প্রথা অপেক্ষা লোকানুমোদিত প্রথা বেশী শুদ্ধ। আমি অশুদ্ধ পণ্ডিতি প্রথা অপেক্ষা বিশুদ্ধ লৌকিকপ্রথা বেশী পচ্ছন্দ করি, তাই বলিবার সময় বলি এবং লিখিবার সময় লিখি তমো, রজো, নভো, সরো ইত্যাদি।

প্রশ্ন। সত্বগুণের সত্ব-শব্দটা গুণের কোটায় উড়িয়া-আসিয়া-জুড়িয়া বসিয়াছে, তাহা তো দেখিতেছি; কিন্তু কোথা হইতে যে তাহা আসিল, তাহার বাষ্পও আমি বুদ্ধিতে হাৎড়াইয়া পাইতেছি না।

উত্তর। সত্ব-শব্দ কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহা চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই তো পারো; তবে কেন চক্ষু বুজিয়া এদিক্-ওদিক্ হাৎড়াইয়া বেড়াও? সত্বশব্দ কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহাই যেন তুমি জানো না; কিন্তু মনুষ্যত্ব কোথা হইতে আসিয়াছে— তাহা তো আর তোমার অবিদিত নাই। মানুষের যেমন মনুষ্যত্ব, সতের তেমনি সত্ব। এমন যদি কোনো গুণ থাকে, যাহার বিদ্যমানতার বলেই মনুষ্য মনুষ্য, আর যাহার অবিদ্যমানে মনুষ্য মনুষ্য হইয়াও মনুষ্য নহে, তবে তাহারই নাম যে মনুষ্যত্ব—এটা অবশ্য তুমি জানো; এটাও তেম্নি তোমার জানা উচিত যে, এমন যদি কোনো গুণ থাকে, যাহার বিদ্যমানতা'র বলেই সৎ সৎ, এবং যাহার অবিদ্যমানে সৎ সৎ হইয়াও সৎ নহে, তবে তাহারই নাম সত্বগুণ। সৎ যদি মূলেই প্রকাশ না পা'ন; না তাঁহার আপনার নিকটে, না অন্যের নিকটে, কাহারো নিকটে, কস্মিন্‌কালেও যদি তাঁহার প্রকাশের সম্ভাবনা না থাকে, তবে তিনি থাকিয়াও নাই। সৎশব্দের মূলধাতু অস্‌ধাতু, অস্‌ধাতুর অর্থ থাকা; যিনি আছেন, তিনিই সৎ; আর, তিনিই সৎরূপে প্রকাশ পা'ন; তিনি যদি মূলেই প্রকাশ না পা'ন, তবে তিনি থাকিয়াও নাই—সৎ হইয়াও সৎ নহেন। তবেই হইতেছে যে, প্রকাশই সেই গুণ, যাহার বিদ্যমানতায় বলে সৎ সৎ এবং যাহার অবিদ্যমানে সৎ সৎ হইয়াও সৎ নহেন। অতএব এটা স্থির যে সতের প্রকাশই সতের সত্ব, প্রকাশগুণই সত্বগুণ। শাস্ত্রে বলেও তাই। সব শাস্ত্রই একবাক্যে বলে যে, প্রকাশই সত্বগুণের বৈশেষিক পরিচয়লক্ষণ।

এই সঙ্গে আর-দুইটি কথা দ্রষ্টব্য ;

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, নৈশ অন্ধকারের প্রতিযোগে যেমন দীপালোক পরিস্ফুট হয়, অপ্রকাশের প্রতিযোগে তেম্নি প্রকাশ পরিস্ফুট হয় ; আবার রাত্রিকালে শয়নঘরের প্রদীপ নিভিয়া যাইবার সময় বিগত-আলোকের প্রতিযোগে যেমন আগত অন্ধকার পরিস্ফুট হয়, তেম্নি প্রকাশের প্রতিযোগে অপ্রকাশও প্রকাশ পাইয়া উঠে। ঘনঘটাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহর নিশীথে যেমন বিদ্যুৎস্ফুরণের সঙ্গে-সঙ্গে আলোক এবং অন্ধকার দোঁহে দোঁহার প্রতিযোগে অভিব্যক্ত হয়, আর সেই সময়ে যেমন ভেকধ্বনির উত্থান-পতনের সঙ্গে-সঙ্গে ধ্বনি এবং নিস্তব্ধতা দোঁহে দোঁহার প্রতিযোগে অভিব্যক্ত হয়, তেম্নি, প্রকাশ এবং অপ্রকাশ দোঁহে দোঁহার প্রতিযোগে অভিব্যক্ত হয়। পৃথিবীর যেমন একপিঠে আলোক, আর-একপিঠে অন্ধকার ; প্রকাশমাত্রেরই তেম্নি একপিঠে প্রকাশ, আর একপিঠে অপ্রকাশ ; তা বই, ন্যূনাধিক অপ্রকাশের সহিত একেবারেই সম্পর্কশূন্য শুধু-প্রকাশ—অমিশ্রপ্রকাশ—অসম্ভব। তোমার নয়ন-মন যদি জন্মাবধি একাল পর্য্যন্ত নিদ্রা, তন্দ্রা, পলকপাত, আলস্য এবং অবসাদ কাহাকে বলে, তাহা না জানিত ; তোমার চক্ষু যদি মীনচক্ষু'র ন্যায় চিরোন্মীলিত হইত, আর সেই সঙ্গে তোমার মন যদি রাজদ্বারের সিপাহীর ন্যায় অনবরত তোমার চক্ষুর দেউড়িতে দাঁড়াইয়া অপ্রমত্তভাবে পাহারা দিত ; আর, যদি তোমার সেই চিরাবহিত নয়নের সম্মুখে জলস্থল-আকাশঅন্তরীক্ষ হইতে তথৈব স্থাবর-জঙ্গম, নির্জীব-সজীব, চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং বসনভূষণ হইতে ক্রমাগতই হ্রাসবৃদ্ধিবিহীন, ছায়া-বিহীন, বৈচিত্র্যবিহীন একরঙা আলোক বাহির হইত, তাহা হইলে তোমার এখনকার এ অবস্থায় তুমি এই যে বলিতেছ—

"যেমন চোক তেম্নি আলো
জুড়ি মিলিয়াছে ভালো!"

তাহা তো তুমি বলিবেই; কিন্তু তোমার তখনকার সে অবস্থায় তুমি দেখিতে যে কিরূপ দৃশ্য—সেইটিই জিজ্ঞাস্য। অন্ধের নিকটে যেমন দিবা-রাত্রি দুইই সমান, তোমার সে অবস্থায় তোমার নিকটে তেম্নি আলোক অন্ধকার দুইই সমান হইত। কোনো পাগল যদি চুনকাম-করা ধ্বধ্বে প্রাচীরের গায়ে শাদা খড়ি দিয়া বাড়ীর নম্বর দাগে, তাহা হইলে যেমন শাদা'য় শাদা ডুবিয়া মরে, তেম্নি তোমার সে-অবস্থার চক্ষের সাম্নে আলো'য় আলো ডুবিয়া মরিত—আলোকের কণামাত্রও তোমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ভোগে আসিত না। তাহা হইলে ফলে দাঁড়াইত এই যে, তুমি চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, আর, জগৎসংসার আলোকের মাঝখানে থাকিয়াও অন্ধকার। অতএব এটা স্থির যে, প্রকাশের সঙ্গে কোনো-না-কোনো অংশে অপ্রকাশের অঞ্জন বা. বিপ্রকাশের রঞ্জন লাগিয়া থাকা চাই-ই-চাই, তা নহিলে প্রকাশের প্রকাশত্ব রক্ষা পাইতে পারে না।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, বিহিত প্রকরণ-পদ্ধতির সোপান না মাড়াইয়া কোনো বিষয়ই অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে সমুত্থান করিতে পারে না। তুমি যদি কিলাইয়া কাঁঠাল পাকাইতে যাও, তবে কিছুতেই তাহা পারিয়া উঠিবে না। কিরূপ প্রক্রিয়ার যোগ-সাযোগে কাঁঠাল পাকাইতে হয়—কাঁঠালগাছই তাহা জানে, আর, সেইজন্য তাহারই তাহা কাজ। সব গুণই যেমন ক্রিয়া'র ফল (সংক্ষেপে—কর্ম্মফল), প্রকাশ এবং অপ্রকাশ গুণও তাই। যাহা প্রকাশ হয়, তাহা ক্রিয়াযোগেই প্রকাশ হয়; যাহা অপ্রকাশ হয়, তাহা কর্ম্মোদ্যম গুটাইয়াই অপ্রকাশ হয়। প্রকাশিতব্য বিষয়ের আপাদমস্তক সব'টাই যদি এক উদ্যমেই প্রকাশ পাইয়া

চোকে, তাহা হইলে অপ্রকাশ একা'ই যে কেবল ঘুচিয়া যায় তাহা নহে, অপ্রকাশের প্রতিযোগিতার অভাবে প্রকাশের প্রকাশত্বও সেইসঙ্গে ঘুচিয়া যায়। ঘোড়সোয়ার যদি ঘোড়া'র রাস একেবারেই ছাড়িয়া ছায়, তবে ঘোড়া উচ্ছৃঙ্খলবেগে ছুটিতে আরম্ভ করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া ফেলিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে; আবার, ঘোড়সোয়ার যদি মাত্রাতীত বলের সহিত রাশ টানিয়া ধরিয়া থাকে, তাহা হইলে ঘোড়া চলৎশক্তিরহিত হইয়া যায়। এই জন্য ঘোড়সোয়ার পরিমাণসঙ্গত বলের সহিত রাশ টানিয়া-ধরিয়া উদ্যমের পিছনে সংযমের এবং সংযমের পিছনে উদ্যমের তার লাগাইতে থাকে; আর, সেইরূপ যথাসঙ্গত উদ্যম এবং সংযমের পর্য্যাবর্ত্তনের প্রভাবে ঘোড়া ঠিক্‌পথে চলিতে থাকে। এইরূপ লাগ্‌মাফিক পর্য্যায়ক্রমে উদ্যম এবং সংযম খাটাইয়া প্রকাশকে অপ্রকাশের ব্যাড়া দিয়া নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে বাঁধিয়া রাখা চাই, তবেই প্রকাশের প্রকাশত্ব অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। প্রকাশকে যখন যথাবিহিত সীমার মধ্যে আগ্‌লাইয়া-রাখিয়া তাল-মান-লয়-সঙ্গত শোভনভাবে চলিতে দেওয়া হয়, তখন প্রকাশের অভাবের (অর্থাৎ অপ্রকাশের) প্রতিযোগে প্রকাশের ভাব প্রকাশ পায়; প্রকাশের সদ্‌ভাবের প্রতিযোগে প্রকাশের অভাব প্রকাশ পায়; আর, প্রকাশের ভাব এবং অভাব দুয়েতেই ক্রিয়াশক্তির প্রভাব প্রকাশ পায়;—প্রকাশের আবির্ভাবে ক্রিয়াশক্তির উদ্যম প্রকাশ পায়; প্রকাশের তিরোভাবে ক্রিয়াশক্তির সংযম প্রকাশ পায়। আবির্ভাব-তিরোভাব ভাবাভাবেরই ওলোট্‌-পালোট্‌; অভাব হইতে ভাবে উত্থান করার নাম আবির্ভাব; ভাব হইতে নাবিয়া-পড়িয়া অভাবে পরিসমাপ্ত হওয়ার নাম তিরোভাব। এই প্রসঙ্গে একটি উদ্ভট

শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না; শ্লোকটি অতি চমৎকার; তাহা এই—

"মণিনা বলয়ং বলয়েন মণির্মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ।
পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ॥
শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শশী শশিনা নিশয়া চ বিভাতি নভঃ।
কবিনা চ বিভুর্বিভুনা চ কবিঃ কবিনা বিভুনা চ বিভাতি সভা॥
বলয়ে শোভয়ে মণি, মণিতে বলয়।
বলয়ে মণিতে শোভে করকিশলয়॥
কমলে সলিল শোভে সলিলে কমল।
কমলে সলিলে শোভে সরো নিরমল॥
সুধাকরে শোভে রাতি, রাত্রে সুধাকর।
নিশিতে শশিতে শোভে বিমল অম্বর॥
নৃপপাশে শোভে কবি, কবিপাশে ভূপ।
কবি-নরনাথে সভা শোভে অপরূপ॥"

শোভার সম্বন্ধে এ যেমন বলিলেন কবি, প্রকাশের সম্বন্ধে তেম্নি বলিতে পারে সত্যের সেবক—

ভাবে ভায় অভাব, অভাবে ভায় ভাব।
সর্ব্ব ভাবাভাবে ভায় সত্যের প্রভাব॥

কিন্তু তুমি ডাক্তারমানুষ; তুমি কবিতা চাও না—তুমি চাও হাড়মাস-কাটা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ; তা বেশ্! আমার পাথেয়-সম্বলের বগ্‌লিতে পথ-চল্‌তি-গোচের বৈজ্ঞানিক প্রমাণও কতক-কতক সংগ্রহ করা আছে; তাহা দেখাইতেছি, প্রণিধান কর—

সমুদ্রের তরঙ্গ মাথা উঁচু করিয়া তটভূমিতে ঢু হানে, ঢু হানিয়াই অবনতমস্তকে পাছু হটে। ঢু-প্রহারের সংরম্ভ-কালে গর্জ্জনধ্বনি উত্থিত হয়; ঢু-প্রহারের বিরামকালে গর্জ্জনধ্বনি থামিয়া যায়; ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, একা কেবল গর্জ্জনধ্বনি

নহে—পরন্তু গর্জ্জনধ্বনিও যেমন, গর্জ্জনধ্বনির বিরামও তেম্নি, দুইই একজোট হইয়া পালাক্রমে মুহুর্মুহু কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, আর, সেই গর্জ্জনধ্বনির ভাবাভাবের সমবেত কার্য্যকারিতায় গর্জ্জনধ্বনির অবিরত ধারা শ্রোতার শ্রবণগোচরে প্রকাশ পাইতে থাকে। বিজ্ঞানের এটা একটা ধ্রুবসিদ্ধান্ত যে, বায়ুর তরঙ্গ শ্রবণপটহে হিল্লোল হানিবার সময়—ঠিক্ যেন সমুদ্রের তরঙ্গ ঢু হানিতেছে, আর ঢু হনিয়াই পাছু হাঠিতেছে—এইভাবে একবার এগোয় এবং একবার পিছোয়; ইহাতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ধ্বনির প্রকাশ ধ্বনির ভাবাভাবের (অর্থাৎ হওয়া-যাওয়ার) মুহুর্মুহু পর্য্যাবর্ত্তনের উপরে (অর্থাৎ ওলোট্‌পালোটের উপরে) ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আলোকের প্রকাশও যে, ঐরূপ ভাবাভাবরূপী দুই নৌকায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ এই যে, বায়ুতরঙ্গের এগোনো-পিছোনা'র ন্যায় ঈথরতরঙ্গের উত্থানপতনও ক্রিয়াশক্তির উদ্যম-সংযমের ওলোট্‌পালোট্। এই-রূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রকাশগুণের সঙ্গে আর-দুইটি গুণ অপরিহার্য্যরূপে জড়িত রহিয়াছে; একটি হ'চ্চে অপ্রকাশ অর্থাৎ প্রকাশের প্রতিবন্ধকরূপী জড়তাগুণ, * এবং আর-একটি হচ্চে শক্তির প্রভাব অর্থাৎ প্রকাশের সোপানরূপী ক্রিয়াগুণ। এই যে তিন গুণ—প্রকাশ, ক্রিয়া এবং জড়তা, ইহাই পাতঞ্জলের যোগ-শাস্ত্রে সত্ত্বরজস্তমোগুণ নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে (সাধনপাদ ১৮শ সূত্র দেখ)।

---

* সাংখ্যের মতে কার্য্য এবং কারণের মধ্যে বস্তুত কোনো প্রভেদ নাই; এইজন্য সাংখ্য-পাতঞ্জলের দৃষ্টিতে, অপ্রকাশরূপী অন্ধকার, এবং, প্রকাশের প্রতিবন্ধকরূপী জড়তা যাহা সেই অপ্রকাশের কারণ, এ দুয়ের একটিও যা, আর-একটিও তা, একই; অপ্রকাশও যা, জড়তাও তা, একই।

এতক্ষণ ধরিয়া যাহা পর্য্যালোচনা করা গেল, তাহাতে এটা বেশ্ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, প্রকাশমাত্রই শাদা-কালো জুড়ি হাঁকাইয়া মনোদ্বারে উপনীত হয়; আর, সেই সময়ে সারথি একহাতে রাশ বাগাইয়া ধরিয়া থাকে এবং আর-এক হাতে চাবুক মুঠাইয়া-ধরিয়া তাহা মৃদুমন্দভাবে তালে-তালে হেলাইতে থাকে। জুড়িঘোড়া হ'চ্চে প্রকাশের ভাবাভাব, আর সারথি হ'চ্চে শক্তির প্রভাব; চাবুক এবং রাশ আর-কিছু না—ক্রিয়ার উদাম এবং সংযম। মোট কথা এখানে যাহা দ্রষ্টব্য, তাহা এই যে, নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সত্ত্ব, রজো এবং তমোগুণের অর্থাৎ প্রকাশ, ক্রিয়া এবং জড়তা'র (inertia'র) যোগাযোগের ব্যাপার; আর, সেই সঙ্গে এটাও দ্রষ্টব্য যে, এক অদ্বিতীয় ধ্রুবসত্যের শক্তির প্রভাব সেই যোগাযোগের প্রবর্ত্তক এবং নিয়ামক। একই অদ্বিতীয় সত্যের শক্তির প্রভাব অনাদি ভূতকাল হইতে প্রত্যেক বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত একই নিয়মে কার্য্য করিয়া আসিতেছে, এবং সেই একই নিয়মে প্রত্যেক বর্ত্তমানকাল হইতে ভবিষ্যতে পদনিক্ষেপ করিয়া চলিতেছে। সেই যে একই নিয়ম, তাহা একই মহাজ্ঞানে স্থির-প্রতিষ্ঠিত, আর, প্রতি বর্ত্তমান হইতে সেই যে ভবিষ্যতে পদনিক্ষেপ, তাহা একই মহাশক্তির নিত্য-ক্রিয়া। পৌরাণিক ভাষায়—ধ্রুব-জ্ঞানরূপী শিবের বক্ষে বা অটল মহাকালের (Eternity'র) বক্ষে, কালতরঙ্গরূপিণী মহাশক্তি বা কালী নৃত্য করিতেছেন। ফলে, বর্ত্তমানমাত্রই হওয়া হইতে যাওয়াতে এবং যাওয়া হইতে হওয়াতে,—আবির্ভাব হইতে তিরোভাবে এবং তিরোভাব হইতে আবির্ভাবে—ক্রমাগতই ঘুরিয়া বেড়ায়; আর, ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়াই তাহার নাম হইয়াছে বর্ত্তমান। "বর্ত্তমান" কিনা বৃত্তিমান্। বর্ত্তন, আবর্ত্তন, আবর্ত্ত (=vortex=বর্ত্ ex), বৃত্ত (=চক্র), বৃত্তি, এ সমস্তই

বৃৎধাতুর সন্তান-সন্ততি। বৃৎধাতুর মৌলিক অর্থ একপ্রকার চক্রবর্ত্তন অর্থাৎ চক্রবৎ ঘুরিয়া বেড়ানো, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। 'বৃত্তিমাত্রই (ক্রিয়ামাত্রই) উদ্যম হইতে অবসানে এবং অবসান হইতে উদ্যমে চক্রবৎ ঘুরিয়া বেড়ায়। বর্ত্তমানমাত্রই চল্‌তি-নৌকা। কোনো বর্ত্তমানই নোঙর করিয়া একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নাই। এক বর্ত্তমান হইয়া যাইতেছে, আর-এক বর্ত্তমান হইয়া দাঁড়াইতেছে, তৃতীয় বর্ত্তমান হ'ব-হ'ব করিতেছে। সব-বর্ত্তমানের মধ্যে যিনি এক-বর্ত্তমান, তিনিই নিত্য-সত্য। বর্ত্তমানে বর্ত্তমানে যাঁহা যাহা প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সেই নব নব ক্রিয়ার নব নব উদ্যম চিরবর্ত্তমান জ্ঞানের নিয়মে নিয়মিত হইতেছে। একই জ্ঞানের নিয়মে এবং একই শক্তির প্রভাবে প্রতি বর্ত্তমান প্রবর্ত্তিত হইতেছে; বর্ত্তমান ক্রিয়ার উদ্যম প্রতিক্ষণে জড়তাশৃঙ্খলদ্বারা বিহিত সীমার মধ্যে বাঁধিয়া রাখা হইতেছে। ক্রিয়াশক্তি একবার উদ্যম প্রকাশ করিয়া বাধা অতিক্রম করিতেছে, একবার উদ্যম সম্বরণ করিয়া বাধা'কে আপনার উপরে কার্য্য করিতে দিতেছে। এইরূপে সৎসমুদ্রে ক্রিয়াতরঙ্গের উত্থান-পতন হইতেছে; আর, সেই ক্রিয়াতরঙ্গের মস্তকের উপরে উত্থান-পতনের সন্ধিস্থলে প্রকাশরূপী ফেণরাজি উদ্বেল হইতেছে। একই অখণ্ড অনাদ্যন্ত জ্ঞানের সর্ব্বতঃপ্রসারিত বক্ষের উপরে একই মহাশক্তি সত্ত্বরজস্তমোগুণের ত্রিপদীচ্ছন্দে নৃত্য করিতেছেন। একদিকে অনাদ্যন্ত অখণ্ড মহাকাল, এবং আর একদিকে অচিন্ত্য আদি হইতে অচিন্ত্য অন্ত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান-মুহূর্ত্তের তরঙ্গমালা, এ দুই বৃহৎব্যাপার দুই নহে, পরন্তু একই; সাঙ্কেতিক ভাষায়—

অনাদ্যন্ত অখণ্ড মহাকাল = অচিন্ত্য আদি ··· + মুহূর্ত্ত + মুহূর্ত্ত + ···অচিন্ত্য অন্ত। দুয়ের অচিন্ত্য ভেদাভেদ অস্বীকার করিবারও

উপায় নাই, ধারণার মধ্যে আঁক্‌ড়াইয়া পাইবারও উপায় নাই। এই অচিন্ত্য ভেদাভেদের সঙ্গমতীর্থে যোগী মহাপুরুষেরা আনন্দে ভোর হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া যান।

•নদীনালার মৎস্যের পক্ষে অগাধসমুদ্রে সাঁতার খেলিয়া বেড়ানো বেশীক্ষণ চলে না; এইজন্য, বিদ্যালয়ের বালক যেমন ক্ষুদ্র মানচিত্রে চক্ষু বুলাইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ সহজ প্রণালীতে একটি অতি যৎসামান্য ক্ষুদ্র বিষয়ের আদি-অন্ত-মধ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সত্ত্বরজস্তমোগুণের বিশ্বব্যাপী পর্য্যাবর্ত্তন-প্রণালীর ভাব বুঝিতে চেষ্টা করা যা'ক্।

এটা সকলেরই জানা কথা যে, অতি একটি ক্ষুদ্রবিষয়ও যখন আমাদের ধারণাতে প্রকাশলাভ করে, তখন তাহা যথাবিহিত প্রকরণপদ্ধতির সোপান মাড়াইয়াই প্রকাশে উত্থান করে, তা বই, হুড়ুৎ করিয়া প্রকাশে চড়িয়া বসে না।

প্রশ্ন। তোমার ও-কথাটিতে আমার মন সহসা সায় দিতে পারিতেছে না। একটি প্রত্যক্ষ-ঘটনা তোমাকে তবে বলি; পরের সাক্ষাতে যদি-চ তাহা প্রকাশ করিতে বারণ কিন্তু তুমি তো আর আমার পর নহ—তোমার সাক্ষাতে তাহা বলিতে দোষ নাই। আমার মনে পড়ে—যখন আমাদের কুলগুরু আমার কর্ণে হ্রীংমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তখন হ্রীংশব্দটি একই অখণ্ড মুহূর্ত্তে আমার শ্রবণগোচরে প্রকাশলাভ করিয়াছিল, তা বই, কোনোপ্রকার প্রকরণপদ্ধতির সোপান মাড়াইয়া তাহা আমার ধারণাতে অধিরূঢ় হয় নাই।

উত্তর। আমাদের দেশের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে একটি প্রসিদ্ধ ন্যায়ের উল্লেখ মাঝে-মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার নাম "উৎপল-শতপত্র-ভেদ ন্যায়।" কথাটা এই;—একশত পদ্মপত্র

গায়ে-গায়ে মিশাইয়া লপেট্‌ভাবে উপর্য্যুপরি বিছাইয়া-রাখিয়া সেই শতপত্রের গুচ্ছটাকে যদি একটা তীক্ষ্ণ লৌহশলাকা দিয়া এক মুহূর্ত্তে এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া বিঁধিয়া ফ্যালা যায়, তাহা হইলে প্রশ্ন একটি উত্থাপিত হইতে পারে এই যে, ঐ পত্র-শতকের মধ্যস্থিত পৃথক্‌-পৃথক্ এক-একটি পত্রের দু-ফোঁড় হইয়া যাইতে সময় লাগিয়াছিল কতটুকু ? এ কথা তুমি বলিতে পারো না যে, তাহাতে একটুও সময় লাগে নাই ; অবশ্যই তাহাতে একটু-না-একটু সময় লাগিয়াছিল ; তবে কি না, তাহা এত অল্পসময় যে, তাহা ধারণাতে উপলব্ধি করা তোমারও কর্ম্ম নহে, আমারও কর্ম্ম নহে ; কিন্তু সেই ধারণাতীত অল্পসময়টুকুও যে কালাংশ, তাহা যে, এক মুহূর্ত্তের শতাংশের একাংশ, সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই। এখন, দেখিতে হইবে এই যে, যেমন ১০০ পত্র = ১ + ১ + ১ + ১ + ইত্যাদি, তেম্নি হ্রীং = হ্ + র্ + ঈ + ং। এই সঙ্গে আরএকটি কথা দ্রষ্টব্য এই যে, দুই হ্রস্ব ই যেমন সন্ধিসূত্রে গ্রথিত হইয়া এক দীর্ঘ ঈ হয়, তেম্নি দুই দ্রুত ই (অর্থাৎ গিট্‌কিরি খেলাইবার সময় গায়ক যেরূপ দ্রুতবেগে ই উচ্চারণ করে, সেইরূপ দ্রুতবেগে উচ্চারিত দুই ই) সন্ধিসূত্রে গ্রথিত হইয়া এক হ্রস্ব ই হয়। দ্রুত ই সাঁটে লেখা যা'ক্ (ই্) এইরূপ করিয়া। এমতে দাঁড়াইতেছে ঈ = ই + ই = ই্ + ই্ + ই্ + ই্। তবেই হইতেছে যে, হ্রীং = হ্ + র্ + ই্ + ই্ + ই্ + ই্ + ং। হ্রীং-শব্দের ঐ সাতটি অবয়ব (হ্, র্, ই্, ই্, ই্, ই্, ং এই সাতটি অবয়ব) একটারপর আর-একটা তোমার কর্ণকুহরে পরে-পরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। অতএব, তুমি এই যে মনেকরিতেছ—হ্রীংশব্দ এক অখণ্ড মুহূর্ত্তে তোমার শ্রবণে প্রকাশলাভ করিয়াছিল, এটা তোমার ভ্রমঃ বই আর কিছুইনহে। ঘটিয়াছিল যাহা, তাহা এই—

মন্ত্রগ্রহণের পূর্ব্বক্ষণে হ্ (অর্থাৎ হসন্ত হ) তোমার শ্রবণ-গোচরে উপস্থিত ছিল না। মন্ত্রোচ্চারণের প্রথম উপক্রমেই হ্ (হসন্ত হ) তোমার শ্রবণগোচরে আবির্ভূত হইল—আবির্ভূত হইয়াই তিরোভূত হইল। তিরোভূত তো হইল, কিন্তু তিরো-ভূত হইয়া—গেল কোথায়? সর্প যেমন সাপুড়িয়ার হস্ত হইতে সরিয়া-পলাইয়া চুব্ড়িতে ঢুকিয়া বিশ্রাম লভে, হসন্ত-হ তেমনি ধারণার হস্ত হইতে সরিয়া-পলাইয়া সংস্কার গহ্বরে ঢুকিয়া বিশ্রাম লভিল। এইরূপে হ্রীংশব্দের সাতটি ব্যষ্টি-অবয়ব একে-একে আবির্ভূত-তিরোভূত হইয়া সংস্কার-গহ্বরে নিলীন হইল; তাহা-দের কোনোটাই স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ লভিতে পারিল না; স্বতন্ত্র-রূপে প্রকাশ লভিবে কেমন করিয়া? হ্, র্, ই্, বা, ং স্বতন্ত্ররূপে উচ্চারণ কর দেখি;—সহস্র চেষ্টা করিলেও কিছুতেই তাহা তুমি পারিয়া উঠিবে না। যাহা স্বতন্ত্ররূপে মুখে উচ্চারণই করা যায় না, তাহা স্বতন্ত্ররূপে ধারণাতে প্রকাশ পাইবে কেমন করিয়া? কেমন করিয়া তবে হ্রীংশব্দ ধারণাতে প্রকাশলাভ করিল? ইহার উত্তর এই যে, যেমন করিয়া ছোটো ছেলেরা পাঠ্যশব্দ বানান করিয়া পাঠ করে—তেম্নি করিয়া! কালিদাসশব্দ পাঠ করিবার সময় ছেলেরা বলে—"ক'এ আকার কা, ল'এ ইকার লি, দ'এ আকার দা, দন্ত্য স, কালিদাস।" পড়ুয়া-বালক যখন বলিতেছে "ল'এ ইকার লি", তখন "ক'এ আকার কা" তাহার মন হইতে সরিয়া পলাইয়াছে; যখন বলিতেছে "দ'এ আকার দা", তখন "ক'এ আকার কা, ল'এ ইকার লি" তাহার মন হইতে সরিয়া পলাইয়াছে; যখন বলিতেছে "দন্ত্য স", তখন "ক'এ আকার কা, ল'এ ইকার লি, দ'এ আকার দা" তাহার মন হইতে সরিয়া পলাইয়াছে। এইরূপে যখন সব-ক'টা অক্ষরই সংস্কার-গহ্বরে

পলাইয়া বসিয়া র'হিল, তখন বালকটি পিছন ফিরিয়া তাহাদিগকে সংস্কারের অন্ধকূপ হইতে স্মরণে টানিয়া-তুলিয়া সব-ক'টাকে যোগসূত্রে বাঁধিয়া একচোটে, বলিল "কালিদাস।" কখনো-কখনো এমনও ঘটে যে, একটি অন্যমনস্ক ছেলে দন্ত্য স বলিয়াই খেই হারাইয়া-ফেলিয়া "কালিদাস" গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না। তেম্নি, গুরু যখন তোমার কাণে মন্ত্র দিতেছিলেন, তখন যদি তোমার মন আর-এক দিকে থাকিত, তাহা হইলে তুমি তাহা শুনিয়াও শুনিতে পাইতে না। সমগ্র কালিদাসশব্দ যেমন করিয়া পড়ুয়া-বালকের ধারণাতে অধিরূঢ় হয়, হ্রীংশব্দ ঠিক্ তেম্নি করিয়া তোমার ধারণাতে অধিরূঢ় হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। হ্রীংশব্দের ব্যষ্টি-অবয়বগুলা তোমার মন হইতে একে-একে সরিয়া-পলাইয়া তোমার প্রাণের (অর্থাৎ অব্যক্ত-চেতনের) যে জায়গাটিতে মাথা গুঁজিয়া লুকাইয়া ছিল, সেই তমোগুণপ্রধান সংস্কারগহ্বরে সত্ত্বগুণপ্রধান জ্ঞানের আলোক নিপতিত হইবামাত্র ঐ ব্যষ্টি-অবয়বগুলা একযোগে হ্রীংবেশে সাজিয়া বাহির হইয়া তোমার ধারণাতে সোয়ার হইয়া বসিল। সত্ত্বগুণের আলোক-রশ্মিকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার কর্ত্তা কে? তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার কর্ত্তা সেই জ্ঞানঘঁ্যাসা মন—ইতিপূর্ব্বে যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে ঈশনা। আনুপূর্ব্বিক তিনটি বিষয়ের সন্ধান পাওয়া গেল এইরূপ—

(১) প্রকাশিতব্য বিষয়ের ব্যষ্টি-উপাদান-গুলি প্রথমেপ্রাণের অব্যক্ত-চেতনে তমোগুণের জড়তাশৃঙ্খলে বাঁধা থাকে। এ অবস্থায়, সেই ব্যষ্টি-উপাদানগুলি অব্যক্ত সংস্কারমাত্র। তা'র সাক্ষী—হ্, র্, ই্, ং এই ব্যষ্টি-উপাদনগুলির কোনোটিই স্বতন্ত্র-রূপ মুখে উচ্চারণ করাও যায় না, শ্রবণে উপলব্ধি করাও যায় না।

(২) রজোগুণের ক্রিয়াচাপল্যে সেই অব্যক্ত ব্যষ্টি-উপদান গুলি মনের অর্দ্ধস্ফুটচেতনে একে-একে আবির্ভূত-তিরোভূত হইয়া প্রকাশে উত্থান করিবার জন্য উড়ু উড়ু করিতে থাকে। তার সাক্ষী—হসন্ত হ (হ্) যখন আবির্ভূত হইয়াই তিরোভূত হইল, তাহা তখন প্রকাশে ওঠো-ওঠো করিয়া উঠিতে পারিল না। একা কেবল হ্ না, হ্, র্, ই্, ই্, ই্ ই্, ং এই সাত ব্যষ্টি-উপাদানের সব-ক'টাই ঐরূপ প্রকাশে ওঠো-ওঠো করিল; কিন্তু উহাদের স্থিতিকালের ক্ষণিকত্ব-এবং-অস্থিরতা-গতিকে উহাদের কোনোটাই প্রকাশে আসন জমাইয়া বসিতে সময় পাইল না। প্রকাশে উঠিবার জন্য এই যে উড়ু-উড়ু-ক্রিয়া—ইহা রজোগুণপ্রধান প্রাণঘ্যাঁসা মনের বাসনামাত্র।

(৩) রাজোগুণপ্রধান বা ক্রিয়াপ্রধান প্রাণঘ্যাঁসা মনের বাসনা উড়ু-উড়ু করিতে করিতে যখন সত্ত্বগুণের প্রকাশালোকের সংস্পর্শ লাভ করে, তখন তাহা জ্ঞানঘ্যাঁসা ঈশনামূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্যষ্টি-উপাদানগুলিকে সংযোগসূত্রে গাঁথিয়া-ফেলিয়া জ্ঞানের সুব্যক্ত-চেতনে উঠাইয়া ছায়। তার সাক্ষী, হ্+র্+ই্+ই্+ ই্+ই্+ং=হ্রীং। সুব্যক্ত, অর্দ্ধব্যক্ত এবং অব্যক্ত চেতনের সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা দেখানো হইয়াছে, আর, সত্ত্ব রজো এবং তমো-গুণের সম্বন্ধে এক্ষণে যাহা দেখানো হইল, তাহাতে এটা বেশ্ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সুব্যক্ত-চেতন-ক্ষেত্রে সত্ত্বগুণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব, অর্দ্ধস্ফুট-চেতন ক্ষেত্রে রজোগুণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব, অব্যক্ত চেতন-ক্ষেত্রে তমোগুণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব। ইহার একটি চুম্বক হস্তলিপি এইরূপ—

চেতন-ক্ষেত্র	গুণ	পরিচয়লক্ষণ
সুব্যক্তচেতন—জ্ঞান	সত্ত্ব	প্রকাশ
অর্দ্ধস্ফুটচেতন—মন	রজো	ক্রিয়া
অব্যক্তচেতন—প্রাণ	তমো	জড়তা

সত্ত্বরজস্তমোগুণের সম্বন্ধে তিনটি কথা সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, সত্ত্বগুণের প্রকাশ-ক্ষেত্রেও যেমন, রজো-গুণের ক্রিয়াক্ষেত্রেও তেম্‌নি, আর তমোগুণের জড়তাক্ষেত্রেও তেম্‌নি, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনগুণ একসঙ্গে বাস করে এবং এক-সঙ্গে কাজ করে; প্রভেদ কেবল এই যে, সত্ত্বগুণের প্রকাশক্ষেত্রে সত্ত্বগুণ অপর দুই গুণকে মাথা তুলিতে না দিয়া আপনি তাহাদের মাথা হইয়া দাঁড়ায়। রজোগুণের ক্রিয়াক্ষেত্রে রজোগুণ অপর দুই গুণকে দাবিয়া রাখিয়া বল প্রকাশ করে। তমোগুণের জড়তাক্ষেত্রে তমোগুণ অপর দুই গুণের উপরে প্রভু হইয়া দাঁড়ায়। একসঙ্গে থাকে সবাই সর্ব্বত্র; তবে কিনা, কোথাও বা কেহ সঙ্গি-দোঁহার পায়ের নীচে, কোথাও বা কেহ সঙ্গি-দোঁহার মাথার উপরে, কোথাও বা কেহ সঙ্গি-দোঁহার মাঝের জায়গায়, আসন পাড়িয়া বসিয়া যায়। যেখানে যে গুণ সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠান করে, সেখানে সেই গুণেরই নাম কীর্ত্তিত হয়, অপর দুই গুণ গণনার মধ্য হইতে বহিষ্কৃত হয়। এমতে দাঁড়াই-তেছে এই যে, সত্ত্বপ্রধান ত্রিগুণই সত্ত্বগুণশব্দের বাচ্য, রজঃ-প্রধান ত্রিগুণই রজোগুণশব্দের বাচ্য, তমঃপ্রধান ত্রিগুণই তমো-গুণশব্দের বাচ্য। ব্যক্তাব্যক্ত চেতনের সম্বন্ধেও তেম্‌নি বলা যাইতে পারে যে, মনোবৃত্তিমাত্রেই জ্ঞান, মন এবং প্রাণ, তিনই একসঙ্গে বর্ত্তমান থাকে; প্রভেদ কেবল এই যে. কোথাও বা জ্ঞানের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব, কোথাও বা মনের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব,

কোথাও বা প্রাণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব। যেখানে জ্ঞানের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব, সেখানে সেই জ্ঞানপ্রধান অন্তঃকরণবৃত্তিই মোটামুটি জ্ঞান-শব্দের বাচ্য; যেখানে ইচ্ছার বা মনের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব, সেখানে সেই মনঃপ্রধান অন্তঃকরণবৃত্তিই মোটামুটি মনঃশব্দের বাচ্য; যেখানে প্রাণের বা অব্যক্ত সংস্কারের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব সেখানে সেই প্রাণপ্রধান অন্তঃকরণবৃত্তিই মোটামুটি প্রাণশব্দের বাচ্য। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে—চক্ষু জ্ঞানপ্রধান বা সত্ত্বগুণপ্রধান, কর্ণ মনঃ-প্রধান বা রজোগুণপ্রধান, রসনাদি প্রাণপ্রধান বা তমোগুণ-প্রধান। * কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে—বাক্ জ্ঞানপ্রধান, হস্তপদ মনঃ-প্রধান (যেহেতু হস্তপদ কর্ম্মপ্রধান, আর, কর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রজোগুণপ্রধান ইচ্ছা বা মন), উদরাদি প্রাণপ্রধান। সর্ব্বেন্দ্রিয়ের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় জ্ঞানপ্রধান, কর্ম্মেন্দ্রিয় মনঃপ্রধান, শ্বাসাদির পরিচালক প্রাণেন্দ্রিয় প্রাণপ্রধান। ভৌতিকরাজ্যে, তেম্নি, আলোক, অন্ধকার এবং গতিক্রিয়া, এ তিনের মধ্যে আলোক সত্ত্বগুণপ্রধান, অন্ধকার তমোগুণপ্রধান, গতিক্রিয়া রজোগুণ-প্রধান। কোনো আলোক অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল, কোনো আলোক অপেক্ষাকৃত মলিন; পীতবর্ণের আলোক অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল, নীলবর্ণের আলোক অপেক্ষাকৃত মলিন। আবার, কোনো আলোকে গতিক্রিয়ার মাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশী, কোনো আলোকে

---

* দেখা যে জ্ঞানপ্রধান, তাহার প্রমাণ এই যে, "দেখ্‌চ না, তোমাকে উনি সৎপথে বাগাইয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছেন," এ কথার অর্থ—বুঝিতেছ না। ইত্যাদি। "গুরু যাহা তোমাকে বলেন, তাহা তোমার শোনা উচিত"—অর্থাৎ তাহাতে মন দেওয়া উচিত; ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে—শ্রবণ মনঃ-প্রধান বা ইচ্ছাপ্রধান। রসনা অর্থাৎ স্বাদেন্দ্রিয় প্রাণপোষক অন্নাদির রসজ্ঞ সুতরাং প্রাণপ্রধান।

তাহা অপেক্ষাকৃত কম। তেম্নি আবার, কোনো অন্ধকার অপেক্ষাকৃত বেশী নিবিড়, কোনো অন্ধকার অপেক্ষাকৃত কম নিবিড়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আলোকের মধ্যেও মাত্রাবিশেষে অন্ধকার এবং গতি রহিয়াছে; তথৈব, অন্ধকারের মধ্যেও আলোক রহিয়াছে, আর, আলোক যখন রহিয়াছে, তখন গতিও রহিয়াছে। গতিক্রিয়া আবার, জড়বস্তুর আশ্রয় ছাড়িয়া একমুহূর্ত্তও স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না কাজেই বলিতে হয় যে, গতিক্রিয়ার মধ্যেও ন্যূনাধিকপরিমাণে জড়তা বর্ত্তমান। উত্তাপও আবার গতিক্রিয়ার সঙ্গের সঙ্গী। শৈত্য যেমন বস্তুসকলের জড়তা'র নিদান, উত্তাপ তেম্নি বস্তুসকলের জড়তা'র প্রতিহন্তা। তা ছাড়া, উত্তাপ আলোকের কনিষ্ঠ-সহোদর। আলোক এবং উত্তাপ, দুইই প্রকাশধর্ম্মী; প্রভেদ কেবল এই যে, আলোক দৃষ্টিক্ষেত্রে প্রকাশলাভ করে, উত্তাপ স্পর্শক্ষেত্রে প্রকাশলাভ করে। ফলে, গতির সঙ্গে জড়তা এবং জড়বিরোধিতা, শৈত্য এবং উত্তাপ, দুইই ন্যূনাধিকপরিমাণে জড়িত থাকে।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, প্রকাশগুণের প্রাদুর্ভাবকালে প্রকাশগুণ নিজেও প্রকাশ পায়, আর, সেই সঙ্গে ক্রিয়াগুণ এবং বাধাগুণ, যাহা পূর্ব্বে অপ্রকাশ ছিল, তাহাও প্রকাশ পায়; প্রকাশের হাঁপায় পড়িয়া অপ্রকাশও প্রকাশ পায়। তার সাক্ষী—জাগরণকালে, জাগরণ যে কিরূপ, তাহাও প্রকাশ পায় আর সেই সঙ্গে সুপ্তি যে কিরূপ, তাহাও প্রকাশ পায়; পক্ষান্তরে সুপ্তিকালে জাগরণও প্রকাশ পায় না, সুপ্তিও প্রকাশ পায় না। এইজন্য, ত্রিগুণের সমবেত কার্য্যকারিতা যে কিরূপ, তাহার সন্ধান পাইতে হইলে সত্ত্বগুণের প্রকাশক্ষেত্রেই অনুসন্ধান চালনা করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা যাহাকে বলেন

Force, তাহা তমপ্রধান রজোগুণ মাত্র; তা বই, তাহা সর্ব্বাঙ্গীন ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি নহে। এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আছেন—যাঁহারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটা ঘড়ির কল করিয়া গড়িয়া তুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ইঁহাদের এইরূপ ধারণা যে মূলপ্রকৃতি একপ্রকার Physical Force—জড়ধর্ম্মী ক্রিয়া-শক্তি—তমঃপ্রধান রজোগুণ; প্রাণও তথৈব চ। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রাণ অচেতন নহে, পরন্তু অব্যক্ত-চেতন। আমার মুখ্য মন্তব্য কথা এই যে, এক অদ্বিতীয় নিত্যসিদ্ধ অজরামর বাস্তবিক সত্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এপারে যেমন—ওপারেও তেমনি—সর্ব্বত্রই পরিপূর্ণ। সেই একমাত্র অদ্বিতীয় বাস্তবিক সত্যের—অর্থাৎ বস্তুগত সত্যের—সত্তা প্রাণরূপী, প্রকাশ জ্ঞানরূপী, এবং প্রকাশাপ্রকাশের তরঙ্গলহরী আনন্দরূপী; এক কথায়—বাস্তবিক সত্য অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা! যে শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের কথা আমি বলিতেছি তাঁহাদের মতে নিছক অপ্রকাশ—তমোগুণ—অন্ধশক্তি—Physical Force—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গোড়ার কথা এবং ভিতরের কথা। তাঁহারা এত যে mental force (মানসিক শক্তি) ব্যয় করিয়া তাঁহাদের ঐ স্বাভিমত সিদ্ধান্তটিকে শোভন বেশে সাজাইয়া দাঁড় করাইয়াছেন—স্নেহান্ধ মাতা যেমন আদুরে ছেলেকে সাজায় সেইরূপে সাজাইয়া দাঁড় করাইয়াছেন, তাঁহাদের সে mental force তবে পদার্থটা কি? তাহা কি শুধুই কেবল Physical force মাত্র—গায়ের জোর মাত্র? গায়ের জোরই বটে! তাঁহারা এই যে একটি কথা বলেন যে, vital force (জীবনী শক্তি বা প্রাণ) এক প্রকার compound (মিশ্র) physical force, এটা তাঁহারা বলেন গায়ের জোরে—তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। তাঁহারা

বেঁস্ জানেন যে, hydrogenএর সঙ্গে hydrogen মিশিলে hydrogenই থাকিয়া যায়, তা বই, তাহাতে করিয়া কোনো compound বস্তু ফলিত হয় না;—হাইড্রোজেনের সহিত অক্সিজেন মিশিলে তবেই তাহার ফল হয় একটা compound বস্তু—যাহার নাম জল। এটা তাঁহারা খুবই জানেন যে, স্বজাতীয় বস্তুর সঙ্গে বিজাতীয় বস্তু মিলিলেই compound বস্তু ফলিত হয়, তা বই, স্বজাতীয় বস্তুর সহিত স্বজাতীয় বস্তু মিলিলে compound বস্তু ফলিত হয় না—স্বজাতীয় পদার্থের যোগে একসের হাই-ড্রোজেন দুই সের হইলে তাহা কিছু আর compound বস্তু হয় না;—ইহা জানিয়াও, ঐ শ্রেণীর পণ্ডিতেরা গায়ের জোরে বলেন যে, Physical forceএর সঙ্গে Physical force মিলিত হওয়া গতিকে সময়ে সময়ে নূতন এক প্রকার compound force উৎপন্ন হয়—তোমার আমার ন্যায় অনভিজ্ঞ লোকেরা যাহাকে বলে vital force (জীবনীশক্তি বা প্রাণ)। এই শ্রেণীর পণ্ডিতেরা vital forceকেই বাঘ দেখেন—কিন্তু chemical forceকে (রাসায়ণিক পাত্র নির্ব্বাচনী শক্তিকে) ঘরের ছেলে ভাবিয়া কোলে করিয়া আদর করেন। এটা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না যে, vital forceও যেমন, chemical forceও তেমনি, দুয়ের কোনোটিই নিছক Physical force নহে—অমিশ্র Physical force নহে। এটা তো তাঁহারা মানেন যে, জলের ভিতরে oxygen এবং hydrogen দুইই মাখামাখিভাবে একত্রে মিলিয়া মিশিয়া অবস্থিতি করে? জল-পরমাণুর ভিতরে oxygen এবং hydrogen শুধুই যদি কেবল গা-ঘ্যাসাঘেঁসি করিয়া থাকিত তাহা হইলে বটে বলিতে পারিতাম যে, জলের অন্তর্নিগূঢ় রসায়নী শক্তি (chemical force)

Physical forceএরই প্রকারান্তর; কিন্তু তাহা তো আর নহে—জলপরমাণুর ভিতরে oxygen এবং hydrogen শুধুই তো আর গা-ঘ্যাঁসাঘেঁসি করিয়া অবস্থিতি করে না;—স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জলের অন্তর্ভূত oxygen এবং hydrogenএর মধ্যে অসংক্রম্যতা (impenetrability) বলিয়া একটা physical প্রাচীরের ব্যবধান নাই;—কাজেই বলিতে হয় যে, জল পরমাণুর মধ্যে oxygen এবং hydrogen অভৌতিক-ভাবে (vital ভাবে) প্রাণে প্রাণে মিশিয়া রহিয়াছে; তবে আর vital-forceএর বাকি রহিল কি? আবার, জল বলিয়া যে একটা অবভাস (phenomenon) তাহা দর্শকের প্রত্যক্ষগোচরেই জল, আর, প্রত্যক্ষ-ক্রিয়া একপ্রকার মানসিক অবভাস (mental phenomenon), তা বই, তাহা physical phenomenon নহে! তবেই হইতেছে যে, জল একদিকে যেমন physical phenomenon, আর এক দিকে তেমনি তাহা mental phenomenon। এইরূপে দাঁড়াইতেছে যে, জল physical vital এবং mental তিনই একাধারে। ফল কথা এই যে, জলের উৎপাদিকা শক্তি compound physical force নহে—পরন্তু তাহা compound ত্রিগুণ;—তাহা সত্ত্বরজস্তমোগুণের সংঘাত। তবে কি না "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তু ত্রিগুণের সংঘাত" এ কথাটা প্রাচীন কাঙালের কথা—এইজন্য এখন তাহা প্রতীচীন পণ্ডিতগণের মূলেই গ্রাহ্যযোগ্য নহে; তাহা বাসী হউক—তখন দেখা যাইবে তাহা ফলে কি না। আমাদের দেশী শাস্ত্রমতে মূলপ্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা এবং বৈকারিক প্রকৃতি বা বিকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণের বৈষম্যাবস্থা। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাও যা', আর, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাম্যাবস্থাও

তা—একই ; আর, "সাম্যে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিতং" এই শাস্ত্রবচনটি যদি সত্য হয়, তবে, মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরাধিষ্ঠিতা ব্রহ্মময়ী ঐশীশক্তি। মূল-প্রকৃতিকে অজ্ঞান বলিতে চাও বলো—যেহেতু তোমার আমার মুখের কথায় প্রকৃত সত্যের কিছুই আইসে যায় না—কিন্তু এটা অবশ্য তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সে যে অজ্ঞান তাহা জ্ঞানভরা অজ্ঞান। তার সাক্ষী, পশুপক্ষীরা যখন প্রকৃতির নিয়মে পরিচালিত হয়, তখন তাহাদের সব কাজই পাকাপোক্ত জ্ঞানের নিয়মে পরিচালিত হয়। বলিতে পারো যে, মৌমাছিরা স্ব স্ব প্রকৃতির অন্ধ উত্তেজনায় শুদ্ধ কেবল আপনার আপনার উদরপূর্ত্তি করিবার জন্য মধু সঞ্চয় করে ; কিন্তু এটাও তো তোমার দেখা উচিত যে, তাহাদের সেই নিজের নিজের অন্ধ প্রকৃতির ভিতরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলপ্রকৃতি চাপা দেওয়া রহিয়াছে ; সেই বিশ্বব্যাপিনী মূলপ্রকৃতি মৌমাছির মধুসঞ্চয়ের ছদ্মবেশে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে রেণু চালা-চালি করিতে থাকে—আর সেই গতিকে ফুলের গর্ব্ভসঞ্চার হইয়া পুষ্পবৃক্ষের বংশ যুগযুগান্তর ধরিয়া নিরবচ্ছেদে প্রবাহিত হইয়া চলিতে থাকে। মৌমাছির নিজের অন্ধ প্রকৃতির সহিত ফুলের মধুর শুদ্ধ কেবল ভক্ষ্যভক্ষক সম্বন্ধ; মূলপ্রকৃতির স্পর্শমণির সংস্পর্শে সেই ভক্ষ্যভক্ষক সম্বন্ধ রক্ষ্যরক্ষক-সম্বন্ধরূপে পরিণত হইতেছে—ইহা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের দেখা কথা। মৌমাছি সচেতন জীব, আর, পুষ্পবৃক্ষ অচেতন উদ্ভিদ্, এরূপ অবস্থায়—পুষ্পবৃক্ষের বংশরক্ষার জন্য মৌমাছির এত মাথাব্যথা কেন? ফল কথা এই যে, মাথাব্যথা মৌমাছির নহে—মাথাব্যথা মূলপ্রকৃতির। উদ্ভিদ্প্রকৃতি এবং জীবপ্রকৃতির মধ্যে যে একটা বৈষম্য আছে—মূলপ্রকৃতির কাছে সে বৈষম্য মূলেই নাই। মূলপ্রকৃতি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাম্যাবস্থা; সাম্যই (equilibrium এবং har-

mony ই) মূলপ্রকৃতির বৈশেষিক পরিচয় লক্ষণ ; আর, একটু পূর্ব্বে যেমন ইঙ্গিত করিয়াছি—"সাম্যে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিতং"—মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরাধিষ্ঠিতা ঐশীশক্তি সুতরাং জ্ঞানময়ী। মূলা প্রকৃতির পথে চলা এবং ব্রহ্মজ্ঞানের পথে চলা একই ; প্রকৃতিস্থ শরীরের নামই সুস্থশরীর ; প্রকৃতিস্থ মনের নামই নিষ্পাপ অন্তঃকরণ ; প্রকৃতিপুরুষ গোড়ায় একই অভিন্ন। এটাও কিন্তু দেখা চাই যে, মূলপ্রকৃতি হইতে পরে পরে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা নীচের নীচের ধাপে সরিয়া দাঁড়াইয়া স্ব স্ব প্রধান হইয়া বৈষম্যে আক্রান্ত হয়। মূলপ্রকৃতি সাম্যস্বরূপা—বৈকারিক প্রকৃতি বা বিকৃতি বৈষম্য-স্বরূপা। প্রত্যেক জীবের স্ব-স্ব-প্রধান বৈকারিক-প্রকৃতি অহঙ্কার-গর্ব্ব। বৈকারিক প্রকৃতির হাড়ে হাড়ে এইরূপ একটা স্বভাবসিদ্ধ অজ্ঞান লাগিয়া থাকে—যেন তাহার মাথার উপরে কেহ অধ্যক্ষ বা নিয়ামক নাই—যেন হাতির মাথার উপরে মাহুত বসিয়া নাই। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যতই বিকৃতি এবং বৈষম্য থাকুক না কেন—মূলপ্রকৃতির অধিষ্ঠানের প্রভাব ভিতরে ভিতরে কার্য্য করিয়া সে সমস্ত বিকৃতি এবং বৈষম্যের দোল-ক্রীড়াকে যথাসময়ে সাম্যের পথে এবং প্রকৃতির পথে বাগাইয়া আনে। সত্ত্বরজস্তমোগুণের বিকৃতিমূলক বৈষম্যকে প্রকৃতিমূলক সাম্যে পরিণত করা, আর, অন্তঃকরণে পরমাত্মার আসন পাতা—একই। যেহেতু "সাম্যে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিতং"। মূলপ্রকৃতির জ্যোতির্ম্ময় আসন নিখিল আকাশে বিছানো রহিয়াছে ; মনুষ্যমণ্ডলীর অন্তঃকরণেও সেই আসন বিছানো চাই—তাহা হইলেই পরমাত্মার অধিষ্ঠানের মঙ্গল-জ্যোতি জীবাত্মার ভোগে আসিবে—নচেৎ তাহা থাকিয়াও নাই।

ব্যক্তাব্যক্তরহস্য এবং ত্রিগুণরহস্যের সঙ্গে যোঝাযুঝি করিয়া যে জায়গাটি তোমার ধারণার আয়ত্তাধীনে আনিবার জন্য এতক্ষণ

ধরিয়া চেষ্টা করিলাম, তাহার একটা মানচিত্র দেখাইতেছি, প্রণিধান কর—

অন্তঃকরণ	চেতন	অবস্থা	গুণ	গুণের পরিচয়লক্ষণ।
জ্ঞান	সুব্যক্ত	জাগ্রৎ	সত্ত্ব	প্রকাশ
মন	অর্দ্ধব্যক্ত	স্বপ্ন	রজো	ক্রিয়া
প্রাণ	অব্যক্ত	সুষুপ্তি	তমো	জড়তা

ইহার পরে আসিতেছে দ্বন্দ্বরহস্য অর্থাৎ প্রাণের চাওয়া এবং জ্ঞানের পাওয়ার—প্রকৃতি এবং পুরুষের—লুকাচুরি-খ্যালা বা দোলোৎসব।

দ্বন্দ্বরহস্য।

॥ ১ ॥ ও-সব তর্ক-বিতর্ক এখন থা'ক্! সন্ধ্যার চন্দ্রমা দেখা দিতেই কুসুম-কাননে মলয়ানিল কেমন দেখ জাগিয়া উঠিল। তোমার সেদিনকার সেই বসন্তবাহারটি গাও—শুনিয়া প্রাণটা ঠাণ্ডা হো'ক্। বলিতেছ "গাই, গাই"—গাহিতেছ কই?

॥ ২ ॥ রোসো! গান'টাকে মনে আনি।

॥ ১ ॥ গান'টা তবে কি তোমার মনে নাই? মনে যদি নাই, তবে আছে তাহা কোথায়? গানটাকে তুমি যে-স্থান হইতে উঠাইয়া আনিয়া তোমার মনের সম্মুখে দাঁড় করাইতে ইচ্ছা করিতেছ—না জানি সেটা কোন্ স্থান! বুঝিয়াছি! গানটি তোমার প্রাণের (অর্থাৎ অব্যক্ত চেতনের) আঁধার ঘরে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িয়া আছে। অবগুণ্ঠন সে আর কিছু না

—তমোগুণ বা জড়তা, ইংরাজিশাস্ত্রে যাহাকে বলে inertia। তমোগুণে অবগুণ্ঠিত হইয়া দিনরাত্রি শুইয়া পড়িয়া থাকা এক-প্রকার রোগ—আল্‌সেমি রোগ। ও-রোগের একমাত্র ঔষধ রজোগুণ কিনা কর্ম্মোদ্যম। অতএব, আর বিলম্ব ভাল না—গান'টাকে ঝট্‌পট্‌ চেতাইয়া তোলো।

॥ ২ ॥ তোমার মতো ব্যস্তবাগীশ ভূ-ভারতে নাই! তোমার জানা উচিত যে, গীতাঙ্গনাটি লজ্জাবতী লতা। তাড়াহুড়া করিয়া আমি যদি তাহাকে "ওঠ্‌ তোর বিয়ে" বলিয়া চেতাইতে যাই, তাহা হইলে বালিকাটি লজ্জায় জড়সড় হইয়া ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া পলাইয়া বসিয়া থাকিবে; সন্ধ্যার অবশিষ্ট সময়টুকুর মধ্যে সে আর আমার এদিক্‌মুখো হবে না।

॥ ১ ॥ অত করিয়া আমাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না—এক ইঙ্গিতেই আমি বুঝিয়াছি সমস্ত! আমি ঘড়ি'র মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম দেখি. তোমার গীতাঙ্গনাটির কতক্ষণে ঘুম ভাঙে।

॥ ২ ॥ এ এ-এ-এ··· !

॥ ১ ॥ গীতটি বেরো'ব বেরো'ব করিতেছে—তা' তো দেখিতেছি; কিন্তু বেরো'চ্চে কই? দেখিতেছি বটে যে, রজো-গুণের উত্তেজনায় গীতটি তোমার অব্যক্ত চেতনের আঁধার ঘর হইতে অর্দ্ধস্ফুট চেতনের ঝাপ্‌সা আলোকে বাহির হইয়াছে—সংস্কারাত্মক প্রাণের শয়নমন্দির হইতে বাসনাত্মক মনের সাজঘরে বাহির হইয়াছে; কিন্তু তবুও সে এখনো পর্য্যন্ত তোমার সুব্যক্ত চেতনের পরিষ্কার আলোকে বাহির হইতে পারিতেছে না—সত্ত্ব-গুণের দীপালোকিত ঈশনাত্মক জ্ঞানের সভামন্দিরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না।

গান।

॥ ২ ॥ বসন্ত আগত ভয়ী সখীরী—ইত্যাদি।

॥ ১ ॥ বলিহারি! সত্ত্বগুণ সাক্ষাৎ মা সরস্বতী! তাহার আবির্ভাবে গীতাঙ্গনাটির অবগুণ্ঠন অপসারিত হইয়া গিয়া যে-মাত্র তাহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মধুর মূর্ত্তি দেখা দিল, আর-অম্নি তৎক্ষণাৎ তোমার কণ্ঠের ফোয়ারা খুলিয়া গেল।

জ্ঞানের সুব্যক্ত চেতনের সঙ্গে সত্ত্বগুণের অর্থাৎ ঈশনাত্মক প্রকাশজ্যোতির—মনের অর্দ্ধস্ফুট চেতনের সঙ্গে রজোগুণের অর্থাৎ বাসনাত্মক ক্রিয়াচাপল্যের—প্রাণের অব্যক্ত চেতনের সঙ্গে তমোগুণের অর্থাৎ জড়তাগর্ভ অপ্রকাশের—দেখিলে কেমন মর্ম্মান্তিক মিল! জ্ঞান-প্রাণ-মন এই যে তিন বস্তু চেতনাচেতন-অর্দ্ধচেতন, আর, সত্ত্ব-তমো-রজো এই যে তিনগুণ প্রকাশা-প্রাকাশ-অর্দ্ধপ্রকাশ—দোঁহার মধ্যে ভেদ আছে বলিয়া কি তোমার মনে হয়? আমার তো তাহা মনে হয় না! কিন্তু তোমার কণ্ঠের ফোয়ারা খুলিয়া গিয়াছে—এখন তাহার উচ্ছ্বাস থামানো ভার। তোমার ভিতরে আমি একটি যুগল মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি। আমি তোমার গানের শুধুই কেবল শ্রোতা—কিন্তু তুমি তোমার গানের শ্রোতা এবং প্রবর্ত্তন-কর্ত্তা দুইই এক সঙ্গে। যে অংশে তুমি তোমার আপনার কণ্ঠনিঃসৃত গানের আপনি শ্রোতা এবং রসগ্রাহী, সেই অংশে তোমার প্রাণের চাওয়া বা বাসনা পরিতৃপ্ত হইতেছে; তেম্নি আবার, যে অংশে তুমি তোমার আপনার গানের আপনি প্রবর্ত্তন-কর্ত্তা, সেই অংশে তোমার জ্ঞানের পাওয়া বা ঈশনা কিনা কর্ত্তৃত্বশক্তি ফলবতী হইতেছে। তোমার মনের মধ্যে শ্রোতা এবং গায়কের, সমজ্দার এবং গুণীর, ভোক্তা এবং কর্ত্তা'র, বাসনা এবং ঈশনা'র, চাওয়া এবং পাওয়ার শুভ-

সম্মিলনে দোঁহার দ্বন্দ্ব মিটিয়া গিয়াছে; তোমার সঙ্গীতজ্ঞান এবং সঙ্গীতাসক্ত প্রাণ হরগৌরীর ন্যায় দুয়ে এক একে দুই হইয়াছে; তাই তোমার এত আনন্দ। তোমার গান শুনিয়া আমার কি আনন্দ হইতেছে না? আমার খুবই আনন্দ হইতেছে; কিন্তু আমার আনন্দ একগুণ—তোমার আনন্দ তিনগুণ। তার সাক্ষী—আমি কেবল গান শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতেছি; তুমি কিন্তু—কি আর বলিব—তোমার ভাগ্যকে বলিহারি—

(১) গান গাইয়া আনন্দ লাভ করিতেছ;
(২) গান শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতেছ;
(৩) গান শুনাইয়া আনন্দ লাভ করিতেছ;

ওঁ বিষ্ণু! মানস সরোবরের মাঝখানে একটি উপদ্বীপ আছে—সে কথাটা তোমাকে বলিতে ভুলিয়াছি! তোমার আনন্দ দেখিয়া সেই উপদ্বীপটির কথা আমার মনে পড়িতেছে। সে উপদ্বীপটির নাম সমাধিউপদ্বীপ। মনঃসমাধান বলিলে যাহা বুঝায় তাহারই সংক্ষিপ্ত নাম সমাধি। মানসসরোবরের দুইপার-ঘ্যাস' দুই কিনারা হ'চ্চে বাসনা এবং ঈশনা, আর, দুয়ের মধ্যিখানে যে একটি উপদ্বীপ আছে—সেইটির নাম সমাধি-উপদ্বীপ। সমাধি-উপদ্বীপের মাঝখানে একটা ফোয়ারা আছে, আর, সেই ফোয়ারার চারিধারে একটি পদ্মবন-শোভিতা পুষ্করিণী আছে। ফোয়ারা এবং পুষ্করিণীর মধ্যে জলের আদানপ্রদান চলিতেছে ক্রমাগতই! পুষ্করিণী বারবার ফোয়ারাতে জলসঞ্চার করিয়া ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, এবং বারান্তরে-বারান্তরে ফোয়ারার জলে ভরাট্ হইয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে। পুষ্করিণীটির নাম হৃৎপদ্মিনী এবং ফোয়ারাটির নাম আনন্দ-উৎস। ব্যাপারটা তবে তোমাকে খুলিয়া বলি;—

জ্ঞানের পাওয়া এবং প্রাণের চাওয়া মানসসরোবরের চখাচখী।

বিচ্ছেদের সময় চখী এপার হইতে (প্রাণের কূল হইতে) ডাকা-ডাকি করে, চখা ওপার হইতে (জ্ঞানের কূল হইতে) সাড়া দ্যায়। মিলনের সময় চখী এপার হইতে প্রাণের সম্বল লইয়া এবং চখা ওপার হইতে জ্ঞানের সম্বল লইয়া সমাধি উপদ্বীপে হৃৎপদ্মিনীর ধারে একত্রে মিলিত হয়; আর-অমি আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া যায়। চাওয়া এবং পাওয়া'র (অর্থাৎ বাসনা এবং ঈশনার) বিচ্ছেদমিলনের এই যে রহস্য, ইহারাই নাম দ্বন্দ্ব রহস্য।

ক্ষেত্র দেখ—

বিচ্ছেদ- কালে		মিলন-কালে		
জ্ঞান } মন	ঈশনা (১)	জ্ঞান } মন	ঈশনা	
মন } প্রাণ	বাসনা (২)	মন } প্রাণ	বাসনা	} আনন্দ

এতদ্ব্যতীত, দ্বৈতাদ্বৈত রহস্য বলিয়া যে একটি বিশ্বব্যাপী রহস্য আছে, তাহা এই দ্বন্দ্বরহস্যেরই বিরাট্ মূর্ত্তি। তোমার এক্ষণ-কার এই গীতোচ্ছ্বাসে কতগুলা দ্বৈত অদ্বৈতে পরিণত হইয়াছে—শুনিবে? তোমাতে গায়ক এবং শ্রোতা দুই নহে কিন্তু এক; যে জন গান শুনিতেছে এবং যে জন গান শুনাইতেছে, সে দোঁহে দুই নহে কিন্তু এক; গান কার্য্যের কর্ত্তা এবং গান রসের ভোক্তা দুই নহে কিন্তু এক; গান গাহিবার ইচ্ছা এবং গান গাহিবার শক্তি দুই নহে কিন্তু এক; প্রাণের চাওয়া এবং জ্ঞানের পাওয়া দুই নহে কিন্তু এক; বাসনা এবং ঈশনা দুই নহে কিন্তু এক; প্রকৃতির প্রবৃত্তি এবং পুরুষকারের প্রবর্ত্তনা দুই নহে কিন্তু এক; গান শুনিবার আনন্দ এবং গান শুনাইবার আনন্দ দুই নহে এক!

এই দ্বন্দ্বরহস্যের মধ্য হইতে অতীব একটি নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে এই যে, এক হাতে তালি বাজে না; ফাঁকা একত্ব বা ইংরাজিতে যাহাকে বলে ছিন্ন সত্তা (abstract entity) তাহা কোনো কার্য্যেরই নহে; তার সাক্ষী—তোমার এই যে গানকার্য্য এ কার্য্যের কারণ কে? গায়ক না শ্রোতা? কারণ যে কে—তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ফলেন পরিচীয়তে। তোমার কাণে যদি তালা লাগিয়া যায়, তাহা হইলে শ্রোতার অভাবে তোমার গানকার্য্য তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যাইবে; আবার, শ্লেষ্মার আক্রমণে তোমার যদি গলা বুজিয়া যায়, তাহা হইলে গায়কের অভাবে তোমার গানকার্য্যের বিপত্তি ঘটিবেতেম্নিই বা ততোধিক। তবেই হইতেছে যে, তোমার গানকার্যের কারণ অ্যাকা কেবল গায়ক না—অ্যাকা কেবল শ্রোতা না—পরন্তু গায়ক এবং শ্রোতার হরিহরাত্মা-ভাবই তোমার জ্ঞানকার্য্যের কারণ। জগৎকার্য্যের কারণ তেম্নি পুরুষনিরপেক্ষ উদাসিনী প্রকৃতিও না এবং প্রকৃতি-নিরপেক্ষ উদাসীন পুরুষও না; পরন্তু প্রকৃতিপুরুষের একাত্মভাবের আনন্দই জগৎকার্য্যের কারণ, আর, সেই আনন্দই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূলাধার। বেদোপনিষদে স্পষ্টই লেখা আছে যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। আনন্দ হইতেই ভূত সকল উৎপন্ন হইতেছে; উৎপন্ন হইয়া আনন্দেরই গুণে বাঁচিয়া থাকিতেছে; এবং জীবনাবসানে আনন্দেরই মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

॥ ২ ॥ আমার এইরূপ ধারণা যে, জগৎকার্য্যের গোড়া'র কথা বুদ্ধিমনের অগোচর।

॥ ১ ॥ তুমি যাহা বলিতেছ—উপনিষদের ঐ বচনটির পর-ছত্রেই তাহা লেখা আছে; তাহা এই যে, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য

মনসা সহ” সে তত্ত্ব এরূপ মহানিগূঢ় এবং অনির্ব্বচনীয় যে, মনের সহিত বাক্য তাহার নাগাল না পাইয়া সেখান হইতে ফিরিয়া আসে। কিন্তু আবার, তাহার অব্যবহিত পরেই লেখা আছে “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন” ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন তিনি কোথা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হ'ন না।” তা শুধু না, উহার দুই এক পংক্তি পূর্ব্বে এ কথাও লেখা আছে যে, সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়ের মূলাধার সেই-যে-আনন্দ তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর তিনিই ব্রহ্ম। একটা ছোটো খাটো কথা ধরা যা'ক্।

জগদ্বিখ্যাত কবিদিগের কাব্যরচনার গোড়া'র কথা তোমার কিরূপ মনে হয়? তাহা বুদ্ধিমনের গোচর না অগোচর? একব্যক্তি বলিতে পারে যে, কবির প্রকৃতি হইতে কবিতা আপনা-আপনি উচ্ছ্বসিত হইতেছে; আরএক ব্যক্তি বলিতে পারে যে, কবির পুরুষকারের কর্ত্তৃত্ব প্রভাবে কবিতা ফলাইয়া তোলা হইতেছে; দুই কথাই সত্য—তবে কিনা আধা সত্য। সব-চেয়ে বেশীসত্য তৃতীয় ব্যক্তির কথা; সে কথা এই যে, কবির প্রকৃতি এবং পুরুষকার, বাসনা এবং ঈশনা, একসঙ্গে মিলিয়া এক হইয়া যাওয়া'র আনন্দ হইতে কবিতা উচ্ছ্বসিত হইতেছে। এ না যে, কবি'র প্রকৃতি হইতে কবিতা-রচনা আপনা-আপনি হইয়া যাইতেছে, যেন—কবি নিজে শুধুই কেবল সাক্ষীগোপাল; এও না যে, কবিতা-রচনাতে কবির প্রকৃতির বা প্রাণের কোনো হস্ত নাই—সবই কবির ঈশনাত্মক জ্ঞানের বলে ঘটাইয়া তোলা হইতেছে। এ'ও না! ও'ও না! এ যে বড় বিষম সমস্যা! “অনির্ব্বনীয়” তো আর গাছে ফলে না—ইহারই নাম অনির্ব্বচনীয়। অনির্ব্বচনীয়ই বটে! ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপকের জ্ঞান জ্ঞানই কেবল; ভোগাসক্ত বিলাসীর

প্রাণ প্রাণই কেবল; এ দুটা তাই সুনির্ব্বচনীয়। পরন্তু প্রতিভাশালী মহাত্মাদিগের প্রাণই জ্ঞান, জ্ঞানই প্রাণ; শক্তিই ইচ্ছা, ইচ্ছাই শক্তি; বাসনাই ঈশনা, ঈশনাই বাসনা; চাওয়াই পাওয়া; পাওয়াই চাওয়া; কাজেই অনির্ব্বচনীয়। কবির কবিতা বাহির হয় কোথা হইতে কখন্ তাহা বলিব শুনিবে? মানসসরোবরের সমাধি-উপদ্বাপে হৃৎপদ্মিনীর ধারে যখন কবির বাসনা এবং ঈশনা, প্রকৃতি এবং পুরুষকার, প্রাণের চাওয়া এবং জ্ঞানের পাওয়া, একত্রে মিলিয়া দুয়েএক-একেদুই হয়, তখনই আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া যায়, আর, সেই আনন্দের ফোয়ারা হইতে কবিতা উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে। কবির চিদাকাশে এ-যেমন দেখিতে পাওয়া গেল, সার্ব্বভৌমিক মহাকাশে তেমনি আনন্দের উৎস আছে। সে আনন্দ বুদ্ধিমনের অগোচর অনির্ব্বচনীয়; তাহা মহাপ্রকৃতি এবং মহান্ পুরুষের একাত্মভাবের অটল গম্ভীর এবং মহান্ আনন্দ। সেই মহানন্দের উৎস হইতে নিখিল বিশ্বভুবন উচ্ছ্বসিত হইতেছে। পলকে পলকে, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে, অহোরাত্রে, পক্ষে পক্ষে, অব্দে অব্দে, যুগে যুগে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইতেছে।

॥ ২ ॥ এ যেন বুঝিলাম যে, সৃষ্টিস্থিতি আনন্দেরই ব্যাপার। কিন্তু প্রলয় কিরূপ? প্রলয়ও কি তাই —প্রলয়ও কি আনন্দের ব্যাপার?

॥ ১ ॥ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় তিনেএক-একেতিন। যাহাকে তুমি বলিতেছ শরীরের কান্তি পুষ্টি এবং স্থিতি, তাহার মধ্য হইতে সৃষ্টি এবং প্রলয়ের ব্যাপার দুটাকে (দৈহিক উপকরণ সামগ্রীর উপচয় এবং অপচয়ের ব্যাপার দুটা'কে) বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া কতক্ষণ তুমি স্থিতিটাকে স্বপদে দণ্ডায়মান রাখিতে পারো তাহা

আমি দেখিতে চাই। তোমার মুখে যে রা নাই! তবেই হই-তেছে যে, স্থিতির নামই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়। মোট কথাটা যাহা এখানে দ্রষ্টব্য তাহা এই;—

সুব্যক্ত জ্ঞানে বাস্তবিক সত্তা যাহা সর্ব্বত্র প্রকাশ পায়, যাহা তোমাতে প্রকাশ পায়, আমাতে প্রকাশ পায়, জীবজন্তুতে প্রকাশ পায়, তরুলতা উদ্ভিদে প্রকাশ পায়, কাষ্ঠলোষ্ট্রপাষাণে প্রকাশ পায়, স্বর্ণ রৌপ্য মণিমাণিক্যে প্রকাশ পায়, তাহা কিরূপ পদার্থ? তাহা মোহের নিদ্রা নহে, কল্পনার স্বপ্ন নহে; পরন্তু তাহা সাক্ষাৎ সত্য—তাহা জাগ্রত জীবন্ত সত্য। তবে এটা সত্য যে, যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি শুনিতেছি সমস্তই ঘড়ি ঘড়ি রূপান্তরিত হই-তেছে। হউক্ না রূপান্তরিত; তুষার রূপান্তরিত হইয়া হউক্ না জল; জল রূপান্তরিত হইয়া হউক্ না বাষ্প; বাষ্প রূপান্তরিত হইয়া হউক্ না মেঘ; মেঘ রূপান্তরিত হইয়া আবার হউক্ না জল; জল রূপান্তরিত হইয়া আবার হউক্ না তুষার; যতই যাহা রূপান্তরিত হউক্ না কেন। সবই সত্য; সকলেরই সত্তা বাস্তবিক সত্তা; কাহারো সত্তা আমাদের মনগড়া কাল্পনিক সত্তা নহে। এমন কি, যাহা কিছু আমরা মনে করি আমাদের মনগড়ামাত্র—যেমন স্বপ্নের হাতি-ঘোড়া, তাহারও ভিতরে বাস্তবিক সত্তা জাগিতেছে; কেন না প্রতিধ্বনি যেমন রূপান্তরিত ধ্বনি, কাল্পনিক সত্তা তেম্নি রূপান্তরিত বাস্তবিক সত্তা। সৎশব্দের অর্থ স্বতঃসিদ্ধ নিত্যবস্তু; —সত্তামাত্রই সতেরই সত্তা—বস্তুরই সত্তা—বাস্তবিক সত্তা। সবই সত্য—জাগ্রত জীবন্ত সত্য— অদ্বিতীয় সত্য। সত্য এক, সত্যের প্রকাশ এবং অপ্রকাশ দুই। অপ্রকাশের প্রতিযোগে প্রকাশ আত্ম-সমর্থন করে। স্থলের অপ্রকাশ জলে, জলের অপ্রকাশ স্থলে; দুয়ের এই দুই অপ্রকাশের প্রতিযোগে দুয়ের প্রকাশ

ঘটিয়া উঠে। জলের প্রতিযোগে স্থল পরিস্ফুট হয়, স্থলের প্রতিযোগে জল পরিস্ফুট হয়; রৌদ্রতাপের প্রতিযোগে বটচ্ছায়ার শৈত্য পরিস্ফুট হয়, বটচ্ছায়ার শৈত্যের প্রতিযোগে রৌদ্রতাপ পরিস্ফুট হয়; বিদ্যুতের প্রতিযোগে ঘনান্ধকার পরিস্ফুট হয়, ঘনান্ধকারের প্রতিযোগে বিদ্যুৎ পরিস্ফুট হয়। ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই যে অপরিমেয় বিরাট্ লক্ষণাক্রান্ত তিন তিনের প্রতিযোগে তিন পরিস্ফুট হইয়াছে। এটা কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, যাঁহার প্রকাশ, তাঁহারই অপ্রকাশ; সত্যেরই প্রকাশ, সত্যেরই অপ্রকাশ; সত্যকে ছাড়িয়া প্রকাশও কিছুই নহে, অপ্রকাশও কিছুই নহে; নিখিল জগতের সমস্ত দ্বন্দ্ব-বৈচিত্র্য একই সত্যের নিশ্বাস প্রশ্বাস।

আর একটি কথা মনে রাখা চাই এই যে ক্রমবিকাশের সোপান মাড়াইয়া অপ্রকাশের শয্যা হইতে প্রকাশ মাথা তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, তথৈব, ক্রমাবগুণ্ঠনের সোপান মাড়াইয়া, প্রকাশ, অপ্রকাশের সুখশয্যায় শুইয়া পড়ে। একদিকে প্রাতঃসন্ধ্যার মধ্য দিয়া উষার মুখাবরণ অপসারিত হয়, আর এক দিকে সায়ংসন্ধ্যার মধ্য দিয়া দিবা'র মুখে অবগুণ্ঠন পড়িয়া যায়। এক দিকে শরতের মধ্য দিয়া গ্রীষ্মঋতু শীতে পরিণত হয়, আর এক দিকে বসন্তের মধ্য দিয়া শীতঋতু গ্রীষ্মে পরিণত হয়। প্রাতঃসন্ধ্যা, সায়ংসন্ধ্যা, শরৎ, বসন্ত এইসব মাঝের-মাঝের সন্ধিস্থান দ্বন্দ্বের জোড়স্থান। মনের আনন্দ তেমি-একটি দ্বন্দ্বের জোড়স্থান—জ্ঞানের পাওয়া এবং প্রাণের চাওয়ার শুভ সঙ্গম স্থান। আর একটি রহস্য দেখিতে পাওয়া যায় এই যে, মিলনও আবার দুইরূপ; জ্ঞান যখন প্রাণকে প্রাধান্য দ্যায়, তখনকার মিলন একরূপ। আবার, প্রাণ যখন জ্ঞানকে প্রাধান্য দ্যায়, তখনকার মিলন আর একরূপ। দুইরূপ মিলনের আনন্দও দুইরূপ। জ্ঞানপ্রধান

মিলনের আনন্দ প্রাতঃসন্ধ্যার আনন্দ; প্রাণপ্রধান মিলনের আনন্দ সায়ংসন্ধ্যার আনন্দ। প্রত্যূষে যখন তোমার ঘুম ভাঙিয়া যায়, তখন তোমার প্রাণের চাওয়া কোন্‌দিকে দৌড়ায় তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। তখন তুমি বিছানা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া প্রকাশক্ষেত্রে বাহির হইতে পারিলে বাঁচো; তখন তোমার প্রাণের চাওয়া যায় জ্ঞানোদয়ের প্রতি, কর্ম্মোদ্যমের প্রতি; আর সেইজন্য তখন তোমার আনন্দ হয় জ্ঞানের প্রকাশ-জ্যোতিকে পাইয়া—কর্ম্মের উদ্যমস্ফূর্ত্তিকে পাইয়া। কিন্তু এখন রাত্রি আগত-প্রায়; তোমার চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে এবং মুখে হাই উঠিতেছে। এখন তুমি জ্ঞানোদয়ের আনন্দও চাও না—কর্ম্মোদ্যমের আনন্দও চাও না; এখন তুমি বিছানায় পড়িতে পারিলে বাঁচো! তোমার এখনকার এ অবস্থার নিকটে অপ্রকাশের আনন্দই আনন্দ, বিশ্রামের আনন্দই আনন্দ, নির্ভাবনার আনন্দই আনন্দ, নিশ্চেষ্টতার আনন্দই আনন্দ। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে যেমন চাওয়া এবং পাওয়ার দুইরূপ মিলনের দুইরূপ আনন্দ হইতে জীবের নিদ্রাজাগরণ হয়, বৃহৎব্রহ্মাণ্ডে তেমনি প্রকৃতিপুরুষের মিলনের আনন্দ হইতে দিনরাত্রি হয়, শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ হয়, উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ণ হয়, ইত্যাদি; এ সমস্তই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের আর এক নাম। আবার ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডে যেমন প্রাণ মন এবং জ্ঞান তিনে এক একে তিন, বৃহৎব্রহ্মাণ্ডে তেমনি অস্তি ভাতি এবং আনন্দ তিনেএক একে-তিন; অর্থাৎ জীবাত্মা প্রাণবুদ্ধিমনস্বরূপ, পরমাত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। অস্তি'র সঙ্গে প্রাণের, ভাতি'র সঙ্গে জ্ঞানের, এবং আনন্দের সঙ্গে মনের বা ইচ্ছা'র মিল যে কিরূপ তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। অতএব প্রণিধান কর:—

(১) যাহার গুণে যাহা বর্ত্তিয়া থাকে তাহাই তাহার জীবনী-শক্তি বা প্রাণ। অস্তিত্ব রক্ষা করাই প্রাণের একমাত্র কার্য্য। বর্ত্তিয়া থাকার নামই বাঁচিয়া থাকা, বর্ত্তমানতাই—অস্তিই—প্রাণ। কাষ্ঠপাষাণের ভিতরেও তড়িৎ উত্তাপ এবং আলোক অনবরত তরঙ্গিত হইতেছে—বর্ত্তমান বস্তুমাত্রেরই বুকের ভিতরে প্রাণ ধুক্‌ধুক্ করিতেছে।

(২) যাহার গুণে সত্তা প্রকাশ লাভ করে তাহারই নাম জ্ঞান। প্রকাশের নামই জ্ঞান—ভাতিই জ্ঞান।

(৩) মনের বা ইচ্ছার মাঝের সমাধি স্থানটিই যে, আনন্দের স্থান তাহা একটু পূর্ব্বে বলিয়াছি; বলিয়াছি যে, মনের দুই অঙ্গ—(১) প্রাণঘাঁসা বাসনা এবং (২) জ্ঞানঘাঁসা ঈশনা। তাহার মধ্যে, প্রকাশাপ্রকাশ চাওয়া বাসনার কার্য্য, প্রকাশা-প্রকাশ ঘটাইয়া তোলা ঈশনার কার্য্য। মনের যে জায়গাটি এই দুই মানসাঙ্গের সমাধিস্থান অর্থাৎ যে স্থানটিতে বাসনা এবং ঈশনা দুয়ে এক একে দুই হয়, সেই স্থানটিতেই আনন্দের প্রস্রবণ উন্মুক্ত হয়। ফলে, মানসসরোবর এক প্রকার ত্রিবেণীসঙ্গম—বাসনা যমুনা, ঈশনা, গঙ্গা এবং আনন্দ সরস্বতী এই তিনের ত্রিবেণীসঙ্গম।

দ্বন্দ্বরহস্যের ভিতরে আর একটি যে রহস্য চাপা দেওয়া আছে—সেইটিই চরম রহস্য। সে রহস্য এই :—

আনন্দ শুধু যে কেবল তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানের ঈশনা এবং প্রাণের বাসনার মিলন ক্ষেত্র বা সমাধিকেন্দ্র তাহা নহে। একদিকে যেমন তাহা তোমার আমার ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ জীবাত্মার জ্ঞানের ঈশনা এবং প্রাণের বাসনার সমাধিকেন্দ্র, আর একদিকে তেমি তাহা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড এবং বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের সমাধিকেন্দ্র। যোগী মহাপুরুষদিগের তো কথাই

নাই—উচ্চশ্রেণীর কবিদিগের মনে যখন ঈশনা এবং বাসনা এক হইয়া যায়, তখন দুই ব্রহ্মাণ্ডের সেই সন্ধিস্থানটিতেই আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া যায়। কাব্যের উচ্ছ্বাসকালে কবির জ্ঞান এবং প্রাণ হয় যে, এক, তা তো জানাই আছে; কিন্তু এক যে হয়—কিসের গুণে হয়?. কবির নিজের গুণে হয়—না আর-কোনো কিছুর গুণে হয়? বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের সহিত কবির ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড একীভূত হইলে—তবেই কবির জ্ঞান এবং প্রাণ একীভূত হইতে পারে—তা ভিন্ন অন্য কোনো প্রকারেই তাহা হইতে পারে না। কোনো কবিই বৃহৎব্রহ্মাণ্ড হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া আপনার নিজ-গুণে কবি হইতে পারেন না। কবির প্রাণ জ্ঞান এবং মন এক-রকমের সৎচিৎ এবং আনন্দ, আর, সেই জন্য কবি একরকমের স্বাধীন পুরুষ, এ কথা সত্য; কিন্তু কবি কি রকমের সচ্চিদা-নন্দ—কি রকমেরই বা স্বাধীন পুরুষ—সেইটিই জিজ্ঞাস্য। প্রজাবর্গ যখন রাজপুত্রকে রাজা সম্বোধন করিয়া বলে যে, এ সমস্ত রাজ-ঐশ্বর্য্য তোমারই, তখন রাজপুত্র যে-রকমের রাজা হয়, কবি সেই রকমের সচ্চিদানন্দ স্বাধীন পুরুষ। পিতামাতার গুণ যে পুত্রকন্যাতে বর্ত্তিবে তাহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, আর, মর্ত্ত্যবাসী কবির প্রাণ জ্ঞান এবং মন যে দেবারাধ্য সৎচিৎ আনন্দ হইবে তাহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আশ্চর্য্য এই যে, প্রজাবর্গের কথার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া রাজপুত্র মনে করে যে, আমিই রাজাধিরাজ মহারাজ—পিতা কেহই নহে। রাজপুত্র যদি সৎপুত্র হয় তবে সে অবশ্য বলিতে পারে যে, পিতার রাজ্যই আমার রাজ্য, পিতার মহিমাই আমার মহিমা; কিন্তু তাহার অর্থ এ নহে যে, পিতা হইতে স্বতন্ত্ররূপে আমিই এ রাজ্যের রাজা। ফল কথা এই যে, প্রকৃতি পুরুষের অভেদস্বরূপ সচ্চিদানন্দ

পরমাত্মা সমস্ত জীবাত্মা লইয়া একমাত্র অদ্বিতীয় অখণ্ড পরিপূর্ণ সত্য; তাঁহা হইতে স্বতন্ত্ররূপে কোনো কিছু সত্য হইতে পারা দূরে থাকুক—তাঁহা ছাড়া স্বতন্ত্র কোনো পদার্থ মূলেই নাই। সেই অখণ্ড পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ পুরুষের প্রকাশাপ্রকাশরূপিণী যে প্রকৃতি তাহাও তিনিই স্বয়ং। কবি-মহাকবি হইলেও তাঁহার জ্ঞানপ্রাণের সমাধিস্থান হইতে আনন্দের উৎস উৎসারিত হইতে পারে না—যদি না বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের সচ্চিদানন্দপ্রকৃতিপুরুষ মাতা-পিতা কবির জ্ঞানপ্রাণকে আপনার সহিত এক করিয়া প্রকাশিত না করেন। যিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আনন্দের প্রস্রবণ—তিনিই মহাপুরুষদিগের মনের আনন্দ-প্রস্রবণ। সত্যও দুই নহে, আনন্দের উৎসও দুই নহে। প্রকৃতিপুরুষের অভেদরূপী অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাই একমাত্র আনন্দের উৎস। কিন্তু আনন্দ বলিতে অনেকে অনেকরূপ বোঝেন, আর, তা ছাড়া, কবিদিগের আনন্দ সব সময়ে ঠিক্ জায়গায় পৌঁছে না। এক অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ অখণ্ড সত্য ভিন্ন আর কিছুতেই মনুষ্যের সমগ্র জ্ঞানমন-প্রাণ চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না। সেই এক অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ সত্যে সবই আছে—আনন্দ আছে, জ্ঞান আছে, প্রাণ আছে, শক্তি আছে—"নাই" শব্দই সেখানে নাই। তাঁহারই একতমা শক্তি যাহা আমাদের স্বশক্তিরূপিণী, সেই অহমাত্মিকা অপরা শক্তির বশতাপন্ন হইয়া আমরা মণিহারা ফণীর ন্যায় মণি অন্বেষণ করিয়া সারা হইতেছি এবং আর-যে-শক্তি—সেই দিব্যা পরা শক্তি—আমাদের মন হইতে যাহা ভ্রমপ্রমাদ মোহের নিবিড় অন্ধকার সরাইয়া দিবে, সে শক্তিও তাঁহারই শক্তি। সে শক্তি তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, সে শক্তি তিনিই স্বয়ং। সে শক্তি জগতের সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে; ভূগর্ভে অগ্নিরূপে কার্য্য করি-

তেছে, জীবের হৃদয়ে প্রাণরূপে কার্য্য করিতেছে, মস্তকে বুদ্ধি-রূপে কার্য্য করিতেছে, আকাশে জ্যোতিরূপে দীপ্তি পাইতেছে। আমাদের পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষেরা সেই শক্তিই ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান করিতেন; তাঁহাদের ধ্যানের মন্ত্র ছিল শুধু এই যে, সেই জগৎপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় তেজ যাহা ভূর্ভুবস্ব-রূপী বিশ্বভুবনের সার সর্ব্বস্ব—সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি—তিনি আমাদিগকে জ্ঞানদান করুন। তাঁহার মঙ্গলময়ী শক্তিতে আমাদের জ্ঞানের সম্মুখ হইতে মোহের আড়াল সরিয়া গেলে—সে আড়াল আর কিছুই না কেবল আমাদের চিরাভ্যস্ত সংস্কারের ঘুমের ঘোর এবং বাসনার স্বপ্ন—তাহা সরিয়া গেলে—সাক্ষাৎ সত্যকে পাইয়া আমরা প্রাণ জ্ঞান আনন্দ শক্তি এবং আর যাহা কিছু আমাদের চাই সবই পাইব একাধারে—আমাদের কিছুরই আর অভাব থাকিবে না। তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিব যে, হারামণি আমাদের অন্তরতম আপ্নি, তোমার-আমার—চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তরতম আপ্নি; তাহা হারাইবার জিনিসই নহে। তখন দেখিয়া আমাদের আনন্দ ধরিবে না—যে, যাহার জন্য আমরা বৎসহারা গাভীর ন্যায় সারা-রাজ্য কাঁদিয়া বেড়াইতেছিলাম, তাহা কোথাও যায় নাই, তাহা আমাদের নিকট হইতে নিকটে—হাতের মুঠার মধ্যে; আত্মা তিনি প্রাণ তিনি, জ্ঞান তিনি, আনন্দ তিনি!

———